সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চচত্বারিংশ ভাগ

—— ০ ——

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী



ENGRAVED & PRINTED BY
THE BENGAL AUTOTYPE CO CAL.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪৫

প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতাম।" তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল, এ কথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই :—

> যেমন কুলিমজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদাবি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সেই জন্য তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবেত্তা ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহা হইতে উৎসারিত যে বিবিধ ধারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধ করিয়াছিল, আমাদের আলোচ্য প্রত্নতত্ত্বধারা ঐ বিভিন্ন ধারাসমূহের অন্যতম।

নানা ভাবে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করা যায়—প্রাচীন মুদ্রা মূর্ত্তি পুথি পুস্তক লিপি লেখ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ, ভূগর্ভ হইতে খনিত সৌধ শিলা সীল্ সজ্জা সরঞ্জাম ভূষণ বেশ অলঙ্কার প্রভৃতি উপকরণসমূহের যুগপৎ বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রত্নতথ্য নির্মাণ করিতেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংগৃহীত "দ্রৌপদী", "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি", "আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম-শিল্প" প্রভৃতি প্রবন্ধ ঐরূপ অনুসন্ধানের ফল এবং তাঁহার "বাঙ্গালীর বাহুবল", "ভারত-কলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার"—বিশেষতঃ তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস", "বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (৭ পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি নিবন্ধ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার জাজ্বল্য নিদর্শন।

প্রত্নতত্ত্ব গতিশীল শাস্ত্র—দিন দিন অনুসন্ধানের ফলে নবতর উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে এবং নূতন আলোক সম্পাতের ফলে প্রাচীন সিদ্ধান্ত সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে। বঙ্কিম-যুগে সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশিলা, পাহাড়পুর প্রায় অবিজ্ঞাত ছিল—বেসনগরে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে বাসুদেবের উদ্দেশে গ্রীক-উপাসক 'হিলিওডোরেণ

সমর্পিতং গরুড়ধ্বজং' ভূপ্রোথিত ছিল—সুতরাং "যীশুখ্রীষ্টের অনুকরণে বাসুদেব কৃষ্ণের অবতারত্ব"—এই পাশ্চাত্ত্য উক্তির কোন চরম উত্তর ছিল না। বিশেষতঃ ঐ যুগে হারপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন "সিন্ধুসভ্যতা" স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের উর্বর ক্ষেত্র প্রাচ্যবিদ্যা। যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার আলোচক ও গবেষক, তাঁহাদিগকে 'Orientalist' বলে। বঙ্কিম-যুগে এ দেশে বেবার, লাসেন, কোলব্রুক, গোল্ডষ্টকর, উইলসন, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্গণের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা যে প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্নতত্ত্বা-লোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন—ইহা অবিসংবাদিত, তবে ইহাও নিঃসংশয় যে, তাঁহারা প্রধানতঃ 'গরিমাগ্রন্থির' (superiority complex এর) ফলে অনেক সময় অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। ঐ ওরিয়েণ্টালিষ্টদিগের প্রতি "দ্রৌপদী" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রোষ-কটাক্ষ করিয়াছেন,—

—ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য-জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই কোলব্রুকের নাম শুনিয়াছেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর ইঁহাকে Prince of Orientalists—'প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কোলব্রুকের মত নিপুণ গবেষক ও নৈষ্ঠিক পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড ভুল দেখুন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন,—যাঁহাদের উৎকট বৈরাগ্য হইয়াছে অথচ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই—দেহান্তে তাঁহাদের মোক্ষ হয় না—'প্রকৃতিলয়' হয়—"বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ" (সাংখ্যকারিকা)। ঐ প্রকৃতিলয় কি, এখানে তাহার আলোচনা করিব না—গত বৈশাখের 'পরিচয়ে' সে আলোচনা করিয়াছি।

সাংখ্যকারিকার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ প্রকৃতিলয়ের অর্থ করিয়াছেন—

মৃতঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু প্রধানবুদ্ধ্যহংকারতন্মাত্রেষু লীয়তে।

সকলেই জানেন, সাংখ্যমতে 'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ'—অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র। যিনি প্রকৃতিলীন, তিনি ঐ অষ্ট তত্ত্বের কোন এক তত্ত্বে সুদীর্ঘ কাল বিলীন থাকেন, তদন্তে তাঁহার 'ভবপ্রত্যয়' বা পুনর্জ্জন্ম হয়। সাংখ্যমতের যাঁহারা পল্লবগ্রাহী, এ কথা তাঁহাদেরও অবিদিত নয়। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ কোলব্রুক কি বলিতেছেন, শুনুন,—

Gaurapada makes the meaning of the phrase sufficiently clear, according to him it signifies the resolution of even the subtle body into its constituent elements : but this is not in this case equivalent

to liberation; it is only the term of one series of migrations, the soul being immediately reinvested with another *person*, and commencing a new career of migratory existence until knowledge is attained.

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বের কথা এখানে কিছু বলিব না, কিন্তু কি প্রকারে ও প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়—পাঠক যদি তাহা শিখিতে চান, তবে নিবিড় ভাবে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করুন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম—তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি)। হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ব্ব—হরিবংশেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে রচিত। পুরাণ কি সত্যই প্রাচীন গ্রন্থ—না, পাশ্চাত্যদিগের সিদ্ধান্তিত খ্রীষ্টপর দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতকে সংকলিত অর্বাচীন গ্রন্থ? স্মরণ রাখিতে হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে—এমন কি, অথর্ববেদেও পুরাণের নাম পাওয়া যায়।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ—অথর্ববেদ, ১১।৭।২৪

পুরাণং বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত—শতপথব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩

ইতিহাসঃ পুরাণং—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।১০

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্—ছান্দোগ্য, ৭।১।১

'পুরাণার্থবিশারদ' মহর্ষি বেদব্যাস তদানীং প্রচলিত ঐ 'পুরাণ' আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্প সংগ্রহ করিয়া পুরাণসংহিতা নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

মহামুনি ব্যাস ঐ পুরাণসংহিতা স্বশিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন—

পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।

তৎশিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই মূল সংহিতার উপর তিনখানি উপসংহিতা প্রস্তুত করেন।

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংসপায়নঃ।
লৌমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৯

এই চারিখানি সংহিতাই ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের ভিত্তি। এ ভাবে বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা বলা অসঙ্গত নয়।

অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।

অর্থাৎ, আদিতে পুরাণ এক ছিল, পরে অষ্টাদশ হইয়াছিল—

পুরাণম্ একমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।—মৎস্যপুরাণ, ৫৩।৪

প্রশ্ন উঠিবে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে ঐ অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে পুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরন্তি

অষ্টাশতসহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ ইত্যাদি।—আপস্তম্ব, ২।৫

ঐ দুই শ্লোক কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে অধুনা-প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রের আর এক স্থলে নাম করিয়া ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

আভূতসংপ্লবাৎ তে সর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি ইতি ভবিষ্যৎপুরাণে—আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আপস্তম্ব কত দিনের লোক? প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যুলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব খুব সম্ভব, পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী (পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে জন্মিয়াছিলেন)—অধস্তন পক্ষে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের লোক।

পাণিনির কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে, কিন্তু তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা একরূপ নিঃসংশয়। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র-রচনা করেন, তখনও 'নির্ব্বাণ' শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা আরণ্যক গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই :—

'অরণ্যাদ্ মনুষ্যে'—অরণ্য শব্দের উত্তর 'বুঞ্' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্যবাসী মনুষ্যবাচক 'আরণ্যক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

'নির্ব্বাণোঽবাতে'—নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাত (বায়ুশূন্য স্থান)।

আর এক কথা। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কয়েকখানি পুরাণ নিজ নিজ সঙ্কলন-কাল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন—অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ সম্প্রতি ভারতবর্ষের সম্রাট্।

অভিমন্যোঃ উত্তরায়াং…পরীক্ষিৎ জজ্ঞে যোঽয়ং সাম্প্রতং এতৎ ভূমণ্ডলং অখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তীতি—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২০।১২-৩

গরুড়পুরাণ বলেন, জনমেজয়ই বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁহার উত্তর ভবিষ্য রাজবংশ কীর্ত্তন করেন।

সুহোত্রাণি রমিত্রশ্চ পরীক্ষিৎ অভিমন্যুজঃ।

জনমেজয়স্ত চ সুতো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু।—গরুড়পুরাণ, ১৪৪।৪২

মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন যে, অধিসীমকৃষ্ণ (ইনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র) 'সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ'।

অশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্তু বীর্য্যবান্।

যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।

তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রং তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতং।—মৎস্যপুরাণ, ৫০।৬৬-৭

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতে অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল। অতএব পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ উড়াইয়া দিবার যোগ্য নয়।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের বিবরণে প্রধানতঃ মহাভারতেরই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মহাভারত 'শতসাহস্রী' অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকাত্মক—উহা উগ্রশ্রবা-সৌতি-বিরচিত। সৌতি বলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক) চব্বিশ হাজার শ্লোকাত্মক ভারতসংহিতা নামে এক আদিগ্রন্থ রচনা করেন—

চাতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম।

ভারতসংহিতার বক্তা সঞ্জয় এবং শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র। উহার আরম্ভ ছিল পাণ্ডুর দিগ্‌বিজয়ে—'পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা চ বিক্রমেণ চ' এবং অবসান ছিল ভারত-যুদ্ধের পর পাণ্ডব-বিজয়ে। সেই জন্য ভারতসংহিতার নাম ছিল 'জয়'—'ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ।'

ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঐ ভারতসংহিতা সম্প্রসারণ করিয়া অর্জ্জুনপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভারত। মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা জনমেজয়। যত দূর ধরিতে পারা যায়, বৈশম্পায়নের মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্ববিভাগ ছিল না, সমগ্র গ্রন্থ এক শত পর্বাধ্যায়ে (chaptersএ) বিভক্ত ছিল।

পরে শৌনকের নৈমিষারণ্যে-অনুষ্ঠিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে সেই মহাভারত সৌতি কর্তৃক সমবেত ঋষিসভায় পঠিত হইয়াছিল। আদিম ভারতসংহিতার এই দ্বিতীয় সংস্করণই প্রচলিত মহাভারত। সৌতিই মহাভারতকে অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত করেন। পরবর্ত্তী কালে উহাতে যোগ-বিয়োগ হয় নাই, তা বলি না, তবে মোটের উপর প্রক্ষেপ সত্ত্বেও প্রচলিত মহাভারত সৌতি-রচিত মহাভারতই বটে।

ভারতসংহিতা সম্প্রসারিত হইয়া কবে মহাভারতে পরিণত হইয়াছিল? নিঃসংশয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে পাণিনির সময় মহাভারত প্রচলিত ছিল। পাণিনিতে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, কুন্তী, দ্রোণ ও বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) প্রভৃতির শুধু উল্লেখ আছে, তাহা নয়—পাণিনি 'মহাভারত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণ-গৃষ্টীষ্বাস-জাবাল-ভার-ভারত-
হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু—পাণিনিসূত্র, ৬।২।৩৮

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের উল্লেখ আছে—

সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-
মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

আশ্বলায়নের সময়ে সম্ভবতঃ ভারত ও মহাভারত উভয়ই বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি যাঁহাদিগের তর্পণ করিতে বলিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'ভারত-ও-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ' রহিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বূলার সাহেব বলেন, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে রচিত। কাহারও কাহারও মতে আশ্বলায়ন বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সে যাহা

হউক, তাঁহার পূর্ব্বে ভারতসংহিতা যে মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়।

উপরে যে ভাবে ভারত-সংহিতা ও মহাভারতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে ঠিক তাহাই করিয়াছেন, তাহা নয়। তবে মোট সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার ঐ-রূপই মত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিচারও বেশ নিপুণ বিচার। তদ্দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপকমাত্র নহেন।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, ঋগ্‌বেদসংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। এ কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ কি না, নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, আঙ্গিরস-ঘোর-ঋষি যাঁহাকে 'অক্ষিত' ও 'অচ্যুতে'র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি খুব সম্ভব বাসুদেব কৃষ্ণ—

তদএতদ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপিপাস এব স বভূব।

ছান্দোগ্য হইতে প্রাচীনতর কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও ঐ আঙ্গিরস ঘোরের ও কৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ঐ কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্যের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের একটি মন্ত্রেও কৃষ্ণ-শব্দ পাওয়া যায় (বঙ্কিমচন্দ্র ইহার উল্লেখ করেন নাই)—

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।

ইহার অর্থ—'শতবাহু কৃষ্ণ বরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন' অথবা 'শতবাহু কৃষ্ণবর্ণ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবী উদ্ধৃতা হইয়াছিল'—তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। অতএব প্রমাণস্থলে ঐ মন্ত্রের মূল্য অত্যল্প।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে পুরাণের একটি মূল্যবান্ উপকরণের ব্যবহার করেন নাই—সে উপকরণ পুরাণান্তর্গত 'বংশ' বা genealogy। সকলেই জানেন, পুরাণ পঞ্চলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সেই প্রাচীন যুগে চারণেরা বিখ্যাত রাজবংশের ও ঋষি-বংশের যে সকল genealogy সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুরাণ-সংকলনের সময় ঐ সকল 'বংশ' তাহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। যদুবংশের genealogy ঐরূপ 'বংশ' এবং কয়েকখানি পুরাণে ঐ বংশ-তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন পক্ষে ইহা অকাট্য প্রমাণ।

'রাধয়া মাধবো দেবঃ মাধবেনৈব রাধিকা'—কৃষ্ণলীলায় রাধায় বিশিষ্ট স্থান। অথচ মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ—এমন কি, ভাগবতেও রাধার নামগন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীরাধা কবে প্রবেশ করিলেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ব্রজ-গোপীর কথা বলিতে রাসের কথা তুলিয়াছেন। হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে রাস আছে, কিন্তু রাধা নাই, অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাধিকাই রাসেশ্বরী। পুরাণদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই প্রাচীনতর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার শ্রীরাধাকে যে বিশিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা বিলম্বিত বিবর্ত্তনের দীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই—করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্নতত্ত্বের একটা অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়া রাধার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে।

হোরেস উইলসন (ইনি পুরাণ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন) বলিতেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অতি অপ্রাচীন গ্রন্থ, উহার বয়ঃক্রম মাত্র দুই তিন শত বৎসর—অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ নিতান্ত আধুনিক। আমরাও নির্বিবাদে ঐ মত উদরস্থ করিতাম। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমতঃ 'কৃষ্ণচরিত্রে' ঐ মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন, জয়দেব গোস্বামী একাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তাঁহার 'গীতগোবিন্দে'র কথা কে না জানেন? ঐ গীতগোবিন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি এই :—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে। গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥

—'রাধে। আকাশ দেখ, ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, বনভূমি তমালদ্রুমে অন্ধকারময়। তাহাতে আবার রজনী উপস্থিত। আমার এ শিশুটি (শ্রীকৃষ্ণ) ভয়শীল—তুমিই ইহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পঁহুছিয়া দাও।' নন্দের এই নির্দেশে পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধা-মাধবের যমুনাকূলে অনুষ্ঠিত বিজনকেলিসমূহ জয়যুক্ত হউক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সময় গীতগোবিন্দ রচিত হয়, সে সময় ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন সুবিজ্ঞাত না থাকিলে, গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরম্' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক কখনও রচিত হইত না। এ কথার তাৎপর্য্য কি?

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গীতগোবিন্দের ঐ প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বেশ অস্পষ্ট—টীকাকার, কি অনুবাদকার, কেহই উহা বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে জয়দেবের ঐ 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোকের ভাবার্থ বেশ বিস্পষ্ট হয়। কিরূপে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলেন, একদা নন্দ, শিশু কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন—

একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গো-কুলম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫।১

ইতিমধ্যে মায়া-শিশু শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিলেন—

চকার মায়য়াকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে।

সেই মেঘাবৃত গগন ও শ্যামল কানন দেখিয়া বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে নন্দ ভীত হইলেন—নন্দো ভয়মবাপ হ।

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরং।

ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দংচ দারুণম্॥ ১৫।৪

নন্দ বলিতে লাগিলেন—'কি করি, কোথা যাই—ভবিতা বালকস্য কিম্? শিশুর কি উপায় হয়?' এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ভীত হইয়াই পিতার কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ।

এমন সময় শ্রীরাধা (তিনি তখন পূর্ণ কিশোরী) শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত।

এতস্মিন্ অন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।

নন্দ, রাধিকার রূপলাবণ্যে বিস্মিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ভক্তিভরে বলিলেন—'আমি ঋষিমুখে শুনিয়াছি, তুমি পরাপ্রকৃতি—কমলার অপেক্ষাও হরি-প্রিয়া।'

জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ।

পরাং নির্গুণমচ্যুতাম্ + + ॥

—'হে ভদ্রে! এই তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর—যথাসুখে বিচরণ কর—পরে মনোরথ পূর্ণান্তে আমার পুত্র আমাকে দিও'—

গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে। যথাসুখং।

পশ্চাৎ দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্॥ ১৫।১৫

রাধা মধুর হাস্য করিয়া বালককে গ্রহণ করিলেন—

জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ।

এবং কৃষ্ণকে সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া যথেপ্সিত দূরদেশে গমন করিলেন—

এবমুক্ত্বাতু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।

গত্বাদূরে তং নিনায় বাহুভ্যাং চ যথেপ্সিতম্॥ ১৫।২৫

স্মৃতিমাত্রে সেই বিচিত্র কাননে অপূর্ব্ব রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল—রাধা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—সেখানে পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন কিশোর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন—

পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।

কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্॥

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই ক্রোড়স্থ শিশু অন্তর্ধান করিয়াছেন—তাঁহার স্থলে নবযুবা শ্যামসুন্দর!

ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনং।

সর্ব্বস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ॥ ১৫।৩৫

রাধিকা অনিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত লালসায় পূর্ণ হইল—তিনি 'মদনাতুরা' হইলেন—

নিমেষরহিতা রাধা নবসঙ্গমলালসা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা॥

ইহার পর 'রহঃকেলয়ঃ' যেমন হওয়া উচিত, সম্পন্ন হইল—কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না—

পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্রলোচনাং।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গাং নখদন্তৈশ্চকার হ॥

রতিরণের পর রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বেশবিন্যাস করিতে গেলেন—কি আশ্চর্য্য! অমনি শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিহার করিয়া পূর্ব্ববৎ শিশুরূপ পরিগ্রহ করিলেন! রাধা কি করেন? ত্বরায় বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া মেঘজলের মধ্যে আর্দ্র বসনে রোরুদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দ-গৃহে উপনীত হইলেন এবং যশোদাকে পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।

যশোদা তাহাই করিলেন—

যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্ব চ স্তনং দদৌ।

ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বিবরণ—জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোক যে, এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কি?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—বর্ত্তমান আকারেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্ব্বগামী।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও বর্হাপীড়াভিরাম গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ আছে—

বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ

কিন্তু শ্রীরাধা যে তাঁহার বামে, তাহার নিশ্চয়তা কি?

অনেক দিন অবধি ইহাই পর্য্যন্ত ছিল। ঘটনাক্রমে কয়েক বৎসর হইল 'হালসপ্তশতী' নামক প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থে রাধিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রাকৃত শ্লোকটি এই:—

মুখমারুতেণ তং কহ্ন। গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরবং হরসি॥ ১।৮৯

ইহার সংস্কৃত রূপ এই:—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ। গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনাম্ অন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥

—'রাধিকার মুখসক্ত গোধূলি মুখমারুতে অপনোদন করিয়া হে কৃষ্ণ। তুমি অন্য গোপিকাদিগের গৌরব হরণ করিতেছ।'

হাল কত দিনের লোক? এ বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। অধ্যাপক সেনা (Senart) বলেন, হাল খ্রীষ্টপর তৃতীয় শতকের লোক। অপরে বলেন, তিনি প্রথম শতাব্দীর লোক। যাহাই হউক, হালের সংগৃহীত এই প্রাকৃত শ্লোক নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ কোন মতেই অর্ব্বাচীন নহে। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কালসহকারে দুর্ব্বল না হইয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন—কিরূপ নিপুণ গবেষক ও সূক্ষ্ম বিচারক ছিলেন—এই রাধাতত্ত্বের আলোচনাই তাহার চরম নিদর্শন।

"কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্

কলিকাতা-নগরী অধিবাসি-সংখ্যায় এবং অন্য বহু কারণে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও সর্বপ্রধান নগরী। সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে, লণ্ডনের পরেই কলিকাতার স্থান। "কলিকাতা" এই নামটী, ইহার ইংরেজী উচ্চারণ "ক্যাল্কাটা" ও বানান Calcutta রূপে (জবমানেরা এই নাম লেখে Kalkutta রূপে ও উচ্চারণ করে "কাল্কুত্তা" বা "কালকুটা," এবং ইউরোপের বহু জাতি Calcutta বা Kalkutta লেখে ও "কাল্কুত্তা" উচ্চারণ করে), এখন পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত। আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা শহর খুব প্রাচীন স্থান নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতার গৌরবের পত্তন। ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই। তবে অনুমান হয়, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, একটী বড় বা সমৃদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও পঁহুছাইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখ্যাত স্থান হইয়া দাঁড়ায়।

দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল যে নগরীর, সেই কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও নির্ধারিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়। সাধু বা পুরাতন বাঙ্গালার রূপ "কলিকাতা," কলিকাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার (চলিত-ভাষার) রূপ "ক'ল্‌কাতা, ক'ল্‌কেতা (কোল্‌কাতা, কোল্‌কেতা)," পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার রূপ "কইল্‌কাতা, কইল্‌কাত্তা," উড়িয়া ভাষার রূপ "কলিকতা," পশ্চিমের হিন্দুস্থানীর রূপ "কল্‌কতা" বা "কল্‌কত্তা," এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে প্রথম ইংরেজীতে Hedges হেজেস্ কর্তৃক লিখিত Calgutta, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ওলন্দাজ-লেখক Valentijn ভ্যালেনটাইন কর্তৃক লিখিত Collecatte, ও ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসীদিগকর্তৃক লিখিত Colicotta ও Calecuta—এইগুলি লইয়া, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে প্রচলিত ব্যুৎপত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

[১] "কালীঘাট" শব্দের বিকারে "কলিকাতা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতটীতে অনেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে—প্রাচীন বইয়ে "কলিকাতা" ও "কালীঘাট" দুইটী বিভিন্ন স্থান বলিয়া উল্লিখিত; এবং "কালীঘাট" শব্দ ভাষায় এখন বিদ্যমান আছে, হঠাৎ "কলিকাতা" এই বিকৃত রূপ, সুপরিচিত অর্থ-যুক্ত মূল শব্দটীর পাশে গড়িয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই।

[২] এক ইংরেজ সাহেব এই অঞ্চলে প্রথম যখন আসেন, তখন কলিকাতা অঞ্চলে লোকের বসতি বেশী ছিল না। সাহেবের ঐ স্থানের নাম জানিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু তখন স্থানটীর কোনও নাম ছিল না। সাহেব দেখিলেন, এক জন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটিতেছে। জমীর দিকে হাত দেখাইয়া হিন্দুস্থানীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (সাহেব হইলেই প্রথম হিন্দুস্থানীতে কথা বলিবেন !), এ জায়গার নাম কি ? ঘাসিয়াড়া কখনও সাহেব দেখে নাই, সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, সাহেব তাহার কাটা ঘাসের স্তুপের দিকে দেখাইয়া বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই ঘাস সে কবে কাটিয়াছে। তাই সে হিন্দুস্থানীতে বলিল, "হুজুর, কল্ (কাল) কাটা।" সাহেব তাহাতে বুঝিলেন, স্থানটীর নাম "কাল্‌কাটা", তাহা হইতে "ক্যালকাটা" Calcutta ও পরে বাঙ্গালায় "কলিকাতা" বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বাল্যকালে ইস্কুলে পড়িবার সময়ে এই রূপ গল্প করিয়া আমরা আমোদ করিতাম। কলিকাতা-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিকে অবশ্য বিচারের যোগ্য বলিযা কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু অন্ততঃ আর একটী দেশের নামের সম্বন্ধে অনুরূপ উপাখ্যান আছে। মধ্য-আমেরিকার Guatemala "গুআতেমালা" বা "উআতেমালা" দেশের নামের সম্বন্ধে একটী ঐতিহ্য আছে যে, স্পেনীয়েরা যখন জাহাজে করিয়া গিয়া, ঐ দেশে প্রথম পদার্পণ করে, তখন ঐ দেশের কতকগুলি লোক সমুদ্রের তীরে অদ্ভুত আকারের ও অদ্ভুত বেশের এই বিদেশীদের আগমন ভীত-চকিত হইয়া দেখিতেছিল। স্পেনীয় নায়ক জাহাজ হইতে স্থলে নামিয়া, মাটির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দেশের নাম কি ? স্থানীয় লোকেরা ভাবিল, সমুদ্রকূলে মাটির উপরে যে এক প্রকার মোটা-মোটা ঘাস জন্মিয়াছিল, বিদেশী বোধ হয়, সেই ঘাসকে তাহারা কি বলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাই তাহারা নিজেদের ভাষায় ঐ ঘাসের নাম করিল "উআতে মালা" বা 'মোটা ঘাস'। স্পেনীয় নায়ক স্থানীয় ভাষা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন, উহাই বুঝি দেশের নাম,— স্পেনীয় বানানে লিখিলেন, Guatemala, এবং তাহাই দেশের নাম দাঁড়াইয়া গেল (এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত ইহা অনুমান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন, Guatemala সংস্কৃত "গৌতমালয়" হইতে হইয়াছে, আমেরিকায় প্রাচীন কালে হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের এক অকাট্য যুক্তি এই Guatemala বা "গৌতমালয়" নামের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে !) ।

[৩] সুখে কাল কাটানো যায় বলিয়া এই শহরের নাম "কালকাটা", Calcutta, পরে ইহার বাঙ্গালা বিকৃতি "কলিকাতা"। এই ব্যুৎপত্তিও ইস্কুলের ছেলেদের উপযোগী।

[৪] "কালীক্ষেত্র" হইতে "কলিকাতা"। "কলিকাতা" নামটী কখনও-কখনও সংস্কৃত পুস্তকাদিতে "কালীক্ষেত্র" রূপে রূপান্তরিত হয়, কেহ-কেহ তদ্দৃষ্টে মনে করেন, "কালীক্ষেত্র"-ই আদি নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে।

[৫] "কিলকিলা" এই রূপে "কলিকাতা" নামের আর একটী সংস্কৃতীকরণ শুনিয়াছি—পশ্চিমের পণ্ডিতদের মুখে। ইহা একটী প্রাচীন রূপ বলিয়া কোনও বইয়েও ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই নামের সহিত "কলিকাতা" নামের কোনও ব্যুৎপত্তিগত যোগ নাই।

[৬] Hobson-Jobson অভিধানে, Yule ইউল্ ও Burnell ব্যর্নেল্ সাহেবদ্বয় দেখাইয়াছেন, "কলিকাতা" নামের সহিত হুগলী Golgot বা Golghat "গোলঘাট"-এর গোলমাল ঘটায়, ফরাসী লেখকদের হাতে "কলিকাতা" Golgota, Golgouthe, Golgotha রূপে পরিবর্তিত হয়। Golgotha যীশু-খ্রীষ্টের জীবনীতে উল্লিখিত যেরুশালেমের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান, যেখানে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। Golgotha শব্দটী ইহুদী ভাষায় 'মাথার খুলি' অর্থে gulgoleth শব্দের গ্রীক রূপ, এই শব্দ লাটিনে Calvaria রূপে অনূদিত হয়, তাহা হইতে ইংরেজী Calvary. ইউরোপীয়দের পক্ষে কলিকাতার আবহাওয়া এক সময়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া, অনেক ইউরোপীয়ের মনে সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে এই নামের ('মাথার খুলির বা নরকপালের স্থান') একটা সার্থকতা ছিল।

কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—অথবা কালীঘাটের কালীর সঙ্গে যোগের দরুন কলিকাতা—এই মতটাই এতাবৎ বেশীর ভাগ লোকের মনঃপূত।

"কলিকাতা" নামটীর ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা যাউক।

[১] কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল কাব্যে। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শাকে) রচিত হয়। (বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠ ৬৪-৭৩)। বিপ্রদাস সম্ভবতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাদুড়িয়া-বটগ্রামে বাস করিতেন। চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া, হাওড়া-শিবপুরে বেতড় নামক স্থানে বেতাই-চণ্ডীর পূজা করিয়া ধনও (?) বাহিয়া, চাঁদ সদাগর কালীঘাটে গিয়া কালিকার পূজা করেন।

১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে, কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটী পৃথক্ স্থান। কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—আধুনিক বাঙ্গালায় এই রূপ ধ্বনি-পরিবর্তন, এবং প্রাচীন ও নবীন দুই রূপের এভাবে পাশাপাশি অবস্থান—ইহা অসম্ভব।

[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮০-১৫৮৫ ?) কলিকাতা ও কালীঘাটের পৃথক্-পৃথক্ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ সুপরিচিত।

[৩] ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে—আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। Hobson-Jobson-এ আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। Blochmann ব্লখ্মান্ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসী আইন-ই-আকবরীতে Klkt' (Kalkatā, বা Kalikatā) রূপে নামটী পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠান্তর আছে—Kln'="কল্না", Klt'="কল্তা", Tlp' "তল্পা"। "কল্কতা" ও "তল্পা" এই দুই পাঠভেদ, সর্বপ্রাচীন দুইখানি পুঁথিতে পাওয়া যায়। "কল্কতা, Bkw' বকোয়া ও B'rbkpwr বারবকপুর", এই তিনটী

মহাল সাতগাঁ সরকারের অধীনে ছিল। Bkw' "বকোয়া" এই নামটার আর তিনটী পাঠভেদ আছে—Mkwm' "মকোয়া" বা "মকুয়া", Pkwm' "পকোয়া" বা "পকুয়া", এবং Kw' "কুআ" বা "কোআ"। কোন্‌টা ঠিক পাঠ, তাহা জানা যায় না। তবে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সময়ে কলিকাতা যে একটী লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে—১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহা ভাগীরথীর তীরে উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসায়কেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা-শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি পাথুরে' দলিল। বহু কাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতিহাসবিৎ শ্রীযুক্ত Mesrobv J Seth মেস্‌রোভ সেথ্‌ মহাশয়, কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধি-ফলক হইতেছে, দানশীল বণিক্ Sukias সুকিয়াস্-এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবী-র।' ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩২ অব্দ হয়। বণিক্ সুকিয়াস্ পারস্য-দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইস্‌পহান্-এর নিকটে Julfa জুলফা নগরে তাঁহার নিবাস ছিল। (জুলফা এখনও পারস্য-দেশে উপনিবিষ্ট আরমানীদের একটী প্রধান কেন্দ্র)। এই লেখ হইতে জানা যায় যে, ১৬৩০ সালের দিকে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বশেষে ও শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে, কলিকাতায় আরমানী বণিক্‌দের একটী কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস করিতেন। ইংরেজ Job Charnock যোব চার্‌নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৬০ বৎসর আগে—দুই পুরুষ আগে—আরমানীরা কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আরমানীদের পরে আসে পোর্তুগীসেরা, ও তৎপরে ইংরেজেরা। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, আরমানী, পোর্তুগীস ও ইংরেজ, এই তিন জাতীয় খ্রীষ্টান বণিক্‌গণ কলিকাতায় পাশাপাশি বাস করিয়া কলিকাতার বাণিজ্য-সম্পদে অংশীদার হইত। তখন অবশ্য কলিকাতা ইংরেজদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ইংরেজেরা দিল্লী হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করায়, এবং ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইংরেজদের পূরা অধিকারে আসার ফলে, আরমানী ও পোর্তুগীসদের প্রতিপত্তি বাঙ্গালা-দেশের বাণিজ্যে ও কলিকাতায় ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা বড়িষার সাবর্ণচৌধুরী-বংশীয় জমীদারগণের নিকট হইতে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রাম (ভাগীরথীর পূর্ব তীরে, উত্তর হইতে দক্ষিণে পাশাপাশি অবস্থিত) ক্রয় করে। এবং কলিকাতায় তাহাদের কুঠী নির্মাণ করে। ইহাই হইল কলিকাতার ভবিষ্যৎ গৌরবের সূত্রপাত।

"সুতানুটী" গ্রাম—এখনকার চিৎপুর অঞ্চল লইয়া—মোটামুটি ভাবে, উত্তরে কাশীপুর বাগবাজারের খাল হইতে দক্ষিণে নিমতলাঘাট, জোড়াবাগান, বীডন ষ্ট্রীট পর্যন্ত লইয়া "সুতানুটী" গ্রাম ছিল। সুতানুটীর দক্ষিণে কলিকাতা—মোটামুটি এখনকার ধর্মতলা ষ্ট্রীট

পর্যন্ত কলিকাতা গ্রাম ছিল, এখনকার বহুবাজার ষ্ট্রীট এই কলিকাতা-গ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল। গোবিন্দপুর গ্রাম আদিগঙ্গার ধারে, এখনকার গড়ের মাঠের ও ফোর্ট উইলিয়াম গড়ের কতক অংশ লইয়া ছিল।

"সুতানুটী" নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত—সুতার নুটী, অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়া ঐ নাম। হয়তো ঐ অঞ্চলের আদি নাম ছিল "চিৎপুর", পরে চিৎপুরের অন্তর্গত বা সন্নিকটে যে 'সুতার নুটীর হাট' বসিত, তাহাই "সুতানুটীর হাট" বা "সুতানুটী-হাট" রূপে পরিচিত হয়, ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশ্লিষ্ট স্থানেরই নাম দাঁড়ায় "সুতানুটী"। এই "সুতানুটী" নামেরই অনুরূপ "কলিকাতা" নাম।

"কলিকাতা"—একটী খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। ইহার অর্থ, "কলি" বা কলিচুনের জন্য "কাতা" বা শামুক পোড়া। সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন "সুতানুটী" নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে "কলি-কাতা" নাম। পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়। এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা 'কলি ফিরাইবার' জন্যই প্রশস্ত, সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে। শামুক-পোড়ানো চুন জৈব পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা ঐ চুন দিয়া পান খাইতেন না। পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে, ঐ কারণে পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত।

"কলি"-শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। "কাতা" শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। (এই শব্দ, খয়ের বা খদির অর্থে, "ক্বাথ"-শব্দ-জাত যে "কত্থা" বা "কাথা" শব্দ হিন্দুস্থানীতে ও অন্য পশ্চিমা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন)। উত্তর-বঙ্গে, রাজশাহী জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া চূনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে "কাতা" বলে। পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে বাঙ্গালা-দেশে কোনও-কোনও অঞ্চলে "বাখারী"ও বলে।

কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে। এখনকার বহুবাজার ষ্ট্রীট (অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা 'বৈঠকখানা ষ্ট্রীট' নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা-গ্রাম বা নগরের একটী প্রধান রাস্তা—পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল। এই রাস্তার উত্তর ধারে যে এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বহুবাজার ষ্ট্রীটের উত্তরে "চুনাগলি" পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন যেখান দিয়া নূতন রাস্তা "চিত্তরঞ্জন আভেনিউ" গিয়াছে, বহুবাজারের উত্তরে সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ চিৎপুর ও ছাতাওয়ালা গলীর পূর্বে এবং আধুনিক কলেজ

ষ্ট্রীট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটী স্থানে "চুনারীতলা" (Chunarytollah) নামে একটী পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পুরাতন নক্‌শা ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। এই "চুনারীতলা"-তে "চুনারী" বা চুনের কাজ করিত, এমন লোকেরা বাস করিত। এখন যেমন "শাঁখারীটোলা"-তে এক ঘরও শাঁখারী নাই, তেমনি "চুনারীতলা" হইতে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেক কাল হইল লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেও তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদেব স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান ছিল, এবং "চুনাগলি"র রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও তাহাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। চুনারীতলার আরও একটু পূর্বে, এখনকার কলেজ ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মধ্যে, লেডি ডফরিন হাসপাতালের সন্নিকটে, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়াছে "চুনাপুখুর লেন"। এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং, খাস কলিকাতা-গ্রামে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানুটী ও কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদণ্ড-স্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের (এখনকার বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের) পূর্বে, কলিকাতা গ্রামের পূর্ব সীমানায় বৈঠকখানা পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল, তাহার উত্তরে অনেকখানি জুড়িয়া—"চুনাগলি, চুনারীতলা ও চুনারীপুখুর" অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া—চুনের কাজ হইত। সুতানুটী গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য (কলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তন্তুবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, একথা স্মরণ করিতে হইবে) ক্রমে ঐ নাম পাইয়া থাকে, জোঙড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য "কলি-কাতা" বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই।

এইরূপ দ্রব্যের নামে স্থানের বা গ্রামেব নাম এদেশে বা অন্যত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে : "কেন্দুবিল্ব"—জয়দেব গোস্বামীর বাসস্থান, এক প্রকার ফলের নাম হইতে, "শশা, মুখী, সেহড়া (=শ্যাওড়া), বেত, পটল, কাঁঠাল (ময়মনসিংহ), জগডুম্বুর (বগুড়া); খাগড়া, বয়ড়া (বাঙ্গালার বহু স্থানে—"বহেড়া" ফল হইতে এই নাম হওয়া সম্ভব, যদিও প্রাচীন বাঙ্গালা তাম্রপট্টে এই নামের সংস্কৃতীকরণ পাওয়া যায় 'বথটক' রূপে); শ্রীকলা (যশোহর), বালি (হুগলী), কলাছড়া (হাওড়া); বাবলা, ডুমুর, আমড়া, পাণিফলা (বর্দ্ধমান)"—প্রভৃতি, গাছ বা ফলের নামে গ্রামের নাম, বাঙ্গালা দেশে খুবই সাধারণ। সেই হিসাবে কোনও বস্তুর জন্য বিখ্যাত বা লক্ষণীয়, কোনও স্থানের সহিত সেই বস্তুর নাম সহজেই জড়িত হইয়া যাইতে পারে—বিশেষতঃ যদি জিনিসের নামটী একটু বড় হয়, এবং তাহার সহিত "হাট, গোলা, গঞ্জ, পোতা, নগর, পুর, কাঁদী, পাশা, পাড়া" প্রভৃতি স্থান-বাচক শব্দ সংযুক্ত হইলে নামটী অত্যন্ত বড় হইয়া যায়।

"কলিকাতা" নামটী মাত্র কলিকাতা-মহানগরীতে নিবদ্ধ নহে—বাঙ্গালা-দেশের দুই কোণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, "কলিকাতা" নামে দুইটী গ্রাম আছে। আমার ছাত্র শ্রীমান্

কৃষ্ণপদ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশের গ্রামের নাম লইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি এই গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে আমায় খবর দেন। ঢাকা জেলার লোহজঙ্গ থানার অধীনে, এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম। গত ১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি ঐ দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের পত্র লিখিয়া গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে খবর আনাই। লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রায় তিন মাইল উত্তরে "কলিকাতা-ভোগদিয়া" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ইহার অধিবাসি-সংখ্যা মাত্র ৩১৪ শত, প্রায় সকলেই মুসলমান চাষী, ঐ গ্রামে চুনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব্-ইন্‌স্পেক্‌টর শ্রীযুক্ত অ বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানাব বায়ুকোণে প্রায আড়াই মাইল দূরে "বসপুব-কলিকাতা" গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে "ছোট-কলিকাতা" বলিতেও শোনা যায়)। সব্-ইন্‌স্পেক্‌টব মহাশয়েব বিবরণ তুলিযা দিতেছি: "The village is situated on the northern bank of the river Damodar Its population is about 1000, mainly cultivators. Lime is manufactured in this village from snail-shells (শামুক চুন) on an extensive scale so as to meet the local demands" ঐ স্থানে তিন জন চুনারী মহাজন আছেন, তাঁহাদেব নামও দিয়াছেন।

বাঙ্গালা-দেশের তিনটী কলিকাতাব মধ্যে একটীতে এখনও শামুকেব খোলা পুড়াইয়া চুন তৈয়ারী হইযা থাকে, মহানগরী কলিকাতাতে এক সময়ে চুন প্রস্তুত হইত, এই নগরীব মুখপাত যে কলিকাতা-গ্রামকে অবলম্বন করিয়া, তাহার একটা বড় অংশেও চুনেব কাজ হইত, সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে শামুক-পোড়া ('কাতা') চুন বা কলিচুন প্রস্তুতই ইহাব লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল।

'কলি' শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী') দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুক-পোড়া চুন অর্থে উত্তর-ভারতে সুপ্রচলিত। শব্দটীর বুৎপত্তি অজ্ঞাত। তামিলে Kaıcunnampu 'কর়্-চুন্নাম্পু' বা 'কর়্-শুণ্ণাম্বু' শব্দটী, গৃহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত চুন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই শব্দের প্রথম অংশ 'কর়্' খাঁটী দ্রাবিড়ী শব্দ বলিয়া অনুমান হয়। এই শব্দে যে "র়"-কার আছে, তাহাব দ্বিত্ব হইলে "ত্ত"এর উচ্চারণ হয়। 'কলি' এবং 'কাতা'—উভয় শব্দই কি এই "কর়্, কর্র়্, বা কত্ত্" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত?

বাঙ্গালায় ও উড়িয়াতে "কাতা, কতা" শব্দ 'নারিকেল-দড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেও 'কাতা' শব্দেব বুৎপত্তি অজ্ঞাত। 'কলি ও কাতা' অর্থাৎ কলিচুন ও নারিকেল-দড়ী, এই দুই জিনিসের নাম হইতে 'কলিকাতা' নামের উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, 'চুনের জন্য শামুক-পোড়া' এই অর্থে 'কাতা' শব্দ বাঙ্গালা-দেশের অন্ততঃ একটী প্রান্তে পাইতেছি, এবং প্রাচীন কালের কলিকাতা-গ্রামে চুন প্রস্তুত হওয়ার কিছু প্রমাণ, ও সঙ্গে-সঙ্গে হাওড়া জিলার কলিকাতা-গ্রামে এখনও চুনের কাজের অস্তিত্ব পাইতেছি। এই জন্য "কলিকাতা" শব্দের দ্বিতীয় অংশকে 'নারিকেল-দড়ী' অর্থে 'কাতা' বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিছু কাল পূর্বে আমি 'কাতা' শব্দকে চলিত বাঙ্গালা 'কাত' অর্থাৎ 'পার্শ্বদেশ' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ('কলির কাতা'—'কলিচুনের স্থান বা আড়ৎ')। এখন সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

কৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কৃত হইবার পরে ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আমি যত দূর জানি, ইহার সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। এই পুথির সাঙ্গীতিক অংশে যে নূতনত্ব আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের পরিচিত অন্য কোনও প্রাচীন বা অর্বাচীন পুথিতে রাগ রাগিণী ও তালের এরূপ বিস্তৃত সমাবেশ নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ-সংবলিত সঙ্গীতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। সঙ্গীতে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, আমি এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

প্রথম ইহার অভিনবত্ব। কৃষ্ণকীর্তনের সকল কবিতাই গীত, এই সকল কবিতার উপরিভাগে বিস্তারিত ভাবে সুর ও তাল দেওয়া আছে। (কোনও কোনও গীতে শুধু সুর দেওয়া হইয়াছে, তালের উল্লেখ নাই।) কয়েকটি নমুনা দিলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে:—

পাহাড়ীআ রাগঃ। ক্রীড়া।

গুজ্জরী রাগঃ। কুড়ুকঃ।

কোড়া রাগঃ। অঢ়ুকঃ।

গুজ্জরী রাগঃ। রূপকং। লগনী। জয়জয়।

মালব রাগঃ। প্রকীর্ণকঃ। চিত্রকঃ। লগনী। রূপকং। দণ্ডকঃ।

মালব রাগঃ। বিচিত্র লগনী। দণ্ডকঃ।

রামগিরী রাগঃ। প্রকীর্ণক। চিত্রকং। লগনী। একতালী। দণ্ডকঃ।

বিভাষ রাগঃ। দণ্ডকঃ। একতালী। রূপকথা।

বিভায রাগঃ। একতালী। রূপকথা। দণ্ডকঃ।

পাহাড়ীআ রাগঃ। প্রকীর্ণক। লগনী। দণ্ডকঃ। ক্রীড়া।

অনুস্বার বিসর্গ দেখিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে এই সকল লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যত দূর দেখা যায়, তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে যে সকল রাগরাগিণী বা তালের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণকীর্তনে তাহার অনেক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।

সঙ্গীতরত্নাকর একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব সংকলন করেন। শার্ঙ্গদেব দৌলতাবাদের যাদব-বংশীয় নরপতি সিংঘণের সমকালে বর্তমান ছিলেন। সিংঘণ নরপতি শকাব্দ ১১৩২ হইতে ১১৬৭ (১২১০-১২৪৫ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সঙ্গীতরত্নাকর সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি অতি

প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার টীকাকারও এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে চতুর কল্লিনাথ ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। কল্লিনাথ বিজয়নগরের অভ্যুদয়-কালে (১৪শ হইতে ১৬শ শতক) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল: সঙ্গীতরত্নাকর, বৃহৎ সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীতমুক্তাবলী, সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-চন্দ্রিকা প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থে বহু রাগরাগিণীর নাম আছে এবং তালাধ্যায়ে তালের নাম আছে। সঙ্গীতরত্নাকরে এক শত বিশটি তালের নাম আছে। মতান্তরে তালের সংখ্যা দুই শত চব্বিশ (সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম)। রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ 'দেশী' তালের কথাও বলিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞেরা দেশী তাল ও সুরের সন্ধান রাখিতেন এবং সেগুলিকে তাঁহাদের গণনার মধ্যে আনিতেন। তাল সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য দেশের সুর এবং প্রণালী সম্বন্ধে যতই উৎকর্ষ স্বীকার করা যাউক না কেন, তালের অশেষ প্রকার ভেদ ও তাহার লক্ষণ-নির্দেশ ভারতবর্ষের এক অনন্যসাধারণ বৈলক্ষণ্য। প্রাচীন কালেও বিভিন্ন তালের বোল সঙ্গীতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। (সঙ্গীতরত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে মৃদঙ্গের বোল দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু সঙ্গীতের এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলির সন্ধান মিলে না। কতকগুলি হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। যথা: কক্কু, কহু=ককুভ; আহের=আভীর, আভীরী বা আহীর। রামগিরি= রামক্রী, রামকলি বা রামকেলি। ধানুষী=ধনাশ্রী। লগনী=লাউনী বা লগ্নী নামক গীত। দেশাগ=দেশাখ, দেশাখ্য।

'দণ্ডক' বলিতে একটি ছন্দ বুঝায়।* কিন্তু গীতের প্রসঙ্গে তাহার অবকাশ কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। ক্রীডা, কুড়ুক্ক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ তালের উল্লেখ সঙ্গীত-রত্নাকরের এক শত একবিংশতি তালের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকীর্ণক কি বস্তু? প্রকীর্ণক অর্থে চামর জানি। চৈতন্যমঙ্গল গানে চামরের ব্যবহার দেখা যায়। গায়ক মধ্যে মধ্যে চামর হস্তে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করেন। রামায়ণ-গানেও কোথাও কোথাও এই প্রথা আছে।†

---

* পাদৈঃ স্বরৈর্দণ্ডকেন ছন্দসা দণ্ডকো মতঃ। —সঙ্গীতরত্নাকর।
দণ্ডকাশাবরীবৃত্ত দণ্ডকাশাবরী যথা।
তথা দণ্ডক-কোডারে স রাগঃ কিল জায়তে॥ —রাগতরঙ্গিণী (৩০০ বৎসর পূর্বে রচিত)

† সঙ্গীতরত্নাকরে রাগরাগিণীর বর্ণনায় 'প্রকীর্ণক' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে এরূপ কতকগুলি সুরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা বিষয়-বিভাগের মধ্যে ধরা পড়ে নাই।
প্রকীর্ণকং চ গ্রন্থস্য বিষয়বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বমুচ্যতে।
কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে সুরের বিশেষ উল্লেখ থাকায় এ অর্থ প্রযোজ্য নহে বলিয়া মনে করি।

কিন্তু অঠুক, জয়জয়, চিত্রক, রূপকথা, লগনী, বিচিত্র বা চিত্রক লগনীর অর্থ কি? 'রূপকথা' শব্দটি বেশী প্রাচীন বলিয়া জানা ছিল না। 'রূপকড়া' নামে একটি অল্পপরিচিত তাল আছে বটে, কিন্তু ইহাও আধুনিক। বিশেষজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে হয়ত বলিতে পারিবেন।

আমরা জানি, রাগরাগিণী ও তাল অসংখ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে অনন্ত সমুদ্র বলিয়াছেন,—

নাদাব্ধেস্ত পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে গানের ভিন্ন ভিন্ন গতি, ইহাও সঙ্গীতকারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন :—

দেশে দেশে ভিন্ন নাম তদ্দেশীগানমুচ্যতে।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীত-প্রণালী কোনও দেশীয় বা স্থানীয় রীতির পরিচয় দিতেছে। এই রীতির সম্বন্ধে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা সম্ভবতঃ বেশী প্রাচীন নহে। কারণ, চর্যাপদে আমরা যে প্রাচীন সরল রীতির পরিচয় পাই, তাহা কৃষ্ণকীর্তনে নাই। যথা: রাগ গবড়া, রাগ অরু, পটমঞ্জরী, রামক্রী, বলাড্ডি, মালসী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। চর্যাপদে তালের উল্লেখ নাই, কিন্তু সুরের সরল উল্লেখ আছে।

ইহার পরে জয়দেবে আমরা সঙ্গীতের যে ধারা পাইতেছি, তাহাও প্রাচীন রীতির অনুগামী। গীতগোবিন্দে যে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, তাহা সরল। যথা—মালব রাগ রূপক তাল, গুর্জরী রাগ নিঃসার তাল, বসন্ত রাগ যতি তাল, কর্ণাট রাগ, দেশাগ রাগ একতালী ইত্যাদি। এ সকল কোনও স্থানীয় বা দেশীয় রীতির অনুসরণ করে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ করিলেও সুর তাল সম্বন্ধে অনুকরণ করেন নাই। ইহার কারণ কি? তাহাও ভাবিবার বিষয় বটে।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয়-গ্রন্থে সঙ্গীতের যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ নহে। এই পুস্তকের প্রাচীনতম পুথি দেখিয়া কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যে পুস্তক ছাপিয়াছিলেন, তাহাতে রাগরাগিণীর যে ক্রম দেখা যায়, তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত। তালের নির্দেশ নাই, কেবল সুর দেওয়া আছে; যথা: শ্রীরাগ, সুহইরাগ, রামক্রী, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মল্লার, ধানশ্রী ইত্যাদি। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিতেছেন যে, আদর্শ পুথিখানি চৈতন্য-জন্মের দুই বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল (১৪০৫ শক)। কৃষ্ণকীর্তন যদি ইহার ১০০ কি ১৫০ বৎসর পূর্বে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত বা লিখিত হইয়া থাকে, তবে সে পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কেন অনুসৃত হইল না, তাহাও বিবেচ্য।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পরবর্তী কালের কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীত-রীতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এই পুথিখানি বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত হওয়া

যায়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৮ সালে ইহা আবিষ্কার করেন বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে দেশীয় রাজাদিগের প্রভাবে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল।* সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুর এই সময়ে সঙ্গীতচর্চার জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করে। বীরহাম্বির ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল-পাঠান কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। বৈঠকী সঙ্গীতের চর্চা বঙ্গদেশের মধ্যে এই মল্লরাজগণের প্রভাবে বনবিষ্ণুপুরেই বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। সেই জন্য এখনও আমরা বিষ্ণুপুরী রীতি বলিয়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের একটি অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র প্রণালীর সন্ধান পাই। প্রচলিত হিন্দুস্তানী রীতি হইতে ইহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, সে প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু জানিতে পারিতেছি যে, বিষ্ণুপুরই সঙ্গীতচর্চায় এক দিন বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীতেও যে সেই প্রভাবের ঢেউ পৌছিয়াছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় তিন শত কিংবা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র সঙ্গীতচর্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কীর্তনেরও প্রসার ঘটে। এই সময়ে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গরাণহাটী বা গড়েরহাটী কীর্তনের প্রবর্তন করেন। রাঢ়ে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মনোহরসাহী সুরের সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই যুগ হইতে সঙ্গীতের অনুশীলন বঙ্গদেশে প্রবলভাবে হইয়াছিল ধরা যায় এবং কৃষ্ণকীর্তনও সেই যুগে লিখিত বলিয়া অনুমান করিলে তাহা অসঙ্গত হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ দুইখানি পুথি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার এই আবিষ্কার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩৯ ও ৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। এই পুথির সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধ (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯) ব্যতীত বিশেষ কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। এই পুথি দুইখানি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে একটি বিশেষ সঙ্গীতরীতি প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, ঐ পুথি দুইখানিও বাঁকুড়া অঞ্চলে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই পুথিদ্বয়ের একখানি ১২৩৭ সালে লিখিত, অপরখানি তাহারও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে লেখা। প্রথমতঃ এই পুথি দুইখানিই সঙ্গীতবিষয়ক। অর্থাৎ গীতবাদ্য

* The Rajas of Mallabhum seem now (from the time of Raghunath Singh- Seventeenth Century) to have entered on their palmiest days, if we may judge by the exquisite memorials left by him and his descendants.—O'Maley (District Gazetteer).

ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। কোন তালের কোন গান এবং তাহার কতগুলি কলা ইত্যাদি ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানিতে আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের অদ্ভুত সাঙ্গীতিক নির্দেশ ইহাতে অনুসৃত না হইলেও, যে সকল তালের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিনবত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথা : হরগৌরী, অপূর্বকলা, কুন্দশেখর (কুন্দুশেখর) আলুটী, বিষমসন্ধি, জদ্দ (বা জজ্জ ?) কাঠের (কাচের ?) তাল, চুটখিলা তাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় পুথিখানিতে আরও সব নূতন তালের সন্ধান আছে : দশকোসি জদ্ধতাল, অপূর্বকলিকা, বগুতাল, জলদকান্তি ইত্যাদি। এই সকল তালের বোলে দ্বিতীয় পুথিখানির কলেবর পূর্ণ, সেগুলি মণীন্দ্র বাবু ছাপান নাই। এ পুথিতেও কোন তালের কত কলা, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আছে। এই কলার মধ্যে আবার লঘু, গুরু, সদ্‌গুরু, গুরুর গুরু পরম গুরু প্রভৃতি নানা বিধি-বিধান আছে।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তনের প্রকীর্ণক লগনী চিত্রক প্রভৃতির নামগন্ধ ইহাতে নাই। বরং পাহিড়া, গুজ্জরী প্রভৃতির সঙ্গে বহু পরিচিত সুরের উল্লেখ আছে, যথা : বাগেশ্রী, মঙ্গল, ভীমপলাশী (ডিম্পনাশী নহে—১৮৩ পৃঃ), মাউর, শ্রী ইত্যাদি। এই পুথি দুইখানিতে সুরের সরলতা থাকিলেও তালের অভিনবত্ব লক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই পুথিদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য গীতবাদ্য। গীত অপেক্ষা বাদ্যই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাদ্য সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুকরণে বাদ্যের সংস্কৃত সংজ্ঞা দিবারও চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি দীন অনুকরণ, না আছে তাহাতে ব্যাকরণ, না আছে কোনও অর্থ-সঙ্গতি। যথা—দ্রুতংদ্বয়ং লঘু দ্বয়ং [··] স তাল দশকুশীঙ্ক ভবেং। হয়ত ইহা অশিক্ষিত লোকের লেখা, সে জন্যও এরূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে। যাহা হউক, তালগুলির উদাহরণস্বরূপেই গানগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা হরগৌরী তালের পদাবলী, আলুটী তালের পদাবলী, জদ্দকাঠের তালের পদাবলী, ইত্যাদি। উদাহরণ ব্যতীত গীতের অন্য কোনও মূল্য এই দুই পুথিতে নাই।

সুতরাং তালের উদাহরণ হিসাবে নানা কবির গীত উদ্ধৃত হওয়া উচিত ছিল। ইহাই সাধারণতঃ প্রত্যাশা করা যায় যে, গায়ক বা বাদক বিভিন্ন তালের বিভিন্ন ছন্দ দেখাইবার জন্য চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি হইতে পদ বাছিয়া লইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রণালী অনুসরণ করা হয় নাই। এক জন কবির পদই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তিনি বড়ু (বোঁড়ু, বাঁড়ু বা বটু) চণ্ডীদাস। আর কোনও কবির পদের সঙ্গে যে সংগ্রহকার পরিচিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ একেবারেই পাওয়া যায় না। দুইখানি পুথিতে অনেকগুলি পদ প্রায় সমান এবং প্রায়শঃ দানখণ্ড হইতেই সেই সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলির কবিত্ব বিশেষ কিছু থাকুক বা না-থাকুক, ভাষাভঙ্গী অনেক কৃষ্ণকীর্তনের অনুসারী। যথা,

১ম পুথি (প্রাচীনতর)

মোরে শেচ [··] বড়াই কর কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিবে খামি গুননিধি ॥
অমূল্য রতন মানে (মাগে ?) ধরে মোর হাথে।
মাগএ সুরতি দান * * দেই হাথে ॥
(সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল ১৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২য় পুথি

মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি।
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে ॥
মাগএ শুরতি দান * * দেই হাথে ॥
(ঐ ১৩৪০ সাল ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণকীর্ত্তন :

মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী ॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥ (৮৭ পৃঃ)

'সান দেই মাথে' এই পাঠে কোন অর্থ হয় কি? বসন্তবাবু জোর করিয়া অবশ্য একটি অর্থ করিয়াছেন: মস্তকসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া, কিন্তু ঐ সময় মস্তক-সঞ্চালন-রূপ সঙ্কেতের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। পদাবলীতে 'সান দেও শিঙ্গায়' এরূপ প্রয়োগ পাই। কিন্তু মাথার সান দেওয়া এই প্রথম দেখিতেছি।

এই নবাবিষ্কৃত পুথি দুইখানির অনেকগুলি পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে। রুচি, গ্রাম্যতা-দোষ ও অভিনবত্ব হিসাবেও প্রাপ্ত পুথি এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে অসাধারণ সাম্য দেখা যায়। ভাষার বিচার করিলেও কৃষ্ণকীর্ত্তন ও এই পুথি দুইখানির মধ্যে বড় বেশী কালের ব্যবধান অনুমিত হয় না। অশিক্ষিত লিপিকরের খামখেয়ালী বানান দেখিয়া প্রাচীনত্ব অনুমান* করা সঙ্গত হইবে না। এই খামখেয়ালীপনা কৃষ্ণকীর্ত্তন ও এই পুথি দুইখানি তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। যথা: অমূল [কৃঃ কীঃ], য়মুল (আধুনিক পুথি); আঙ্গুল (কৃঃ কীঃ), য়ঙ্গুলি [আঃ পুঃ], বেশ্যাক [কৃঃ কীঃ] বেউশ্যাক [আঃ পুঃ]।

এই দুইখানি পুথি দেখিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, বাঁকুড়া জেলায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-লেখকের সম্প্রদায়ে তাঁহার পদগুলি গীত হইত এবং নূতন নূতন তাল সহযোগে সেগুলির

---

* সোন=অবগুণ্ঠন, সান কাড়া বা দেওয়া=ঘোমটা দেওয়া। বীরভূম অঞ্চলে এই অর্থে 'সান' শব্দ বহুল প্রচলিত। উত্তমপুরুষে 'দেই' ক্রিয়ার প্রয়োগ সেকালের প্রাচীন সাহিত্যে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'সান দেই' কথাটির চমৎকার অর্থ-সঙ্গতি হয়।—সা. প. প.-সম্পাদক।

প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এই চেষ্টা যে বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রমাণ—

১। কৃষ্ণকীর্তনের অন্য পুথি পাওয়া যায় না।

২। আধুনিক পুথিরও অন্য প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই।

এই গীতগুলির মধ্যে যে একটি সাম্প্রদায়িক ভাব আছে, তাহা এই নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনতর পুথিখানির অনেকগুলি পদ দ্বিতীয় পুথিখানিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত অপর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা দেখা যায়। পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি উৎকৃষ্ট পদ, ইহা পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন বাবুর সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবু এই পদটি তুলিতে ভুলিয়াছেন :

বযু তালের পদাবলি ॥　রাগিণি পটমঞ্জরি ॥

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল ॥
আর কাল হইল মারে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন ॥

লঘু দুবারে ১৪ চৌদ্দ কলা ॥ পরে গুরু ॥

আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল ॥
আর কাল হইল মোরে তরলিয়া বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কানু মুখের হাসি ॥
আর কাল হইল মোরে নয়ানের নির।
আর কাল হইল মোর চিত নহে স্থির ॥
আর কাল হইল মোরে কোকিল্যার স্বর।
আর কাল হইল মোর নিজ পাপ ঘর ॥
আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ ॥
আর কাল হইল মোরে মোহনিঞা বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কাল মুখের হাসি ॥
আর কাল হইল মোরে নাহিক উপায়ে।
আর কাল হইল বটু চণ্ডিদাসে গায়ে ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৬৪ চৌসট্টি কলা।

এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মণীন্দ্রবাবু এই সুন্দর পদটি তাঁহার বিবরণ হইতে বাদ দিয়াছেন। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৫৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পাঠ ধৃত হইয়াছে :

পটমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥

পদকল্পতরু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) ২য় খণ্ড ৯৪৫ পদ ইহারই প্রায় অনুরূপ, ভণিতাও প্রায় এক ঃ

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে এক জন॥

এই পদটির ভাষা, ভাব, ব্যঞ্জনা কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাপ্ত পুথির পদটিতে দ্বিরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে, ভণিতার কলিটি টানিয়া বুনিয়া মিলিত, এইরূপ মনে হয়। পদটিকে দানের পদের মধ্যে ফেলিবার চেষ্টাও দেখা যায়, কারণ, ঐ পুথিতে উদ্ধৃত সবগুলি পদই দানখণ্ডের।

আর কাল হৈল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ॥

এই কলিটি যেন গানের অপরাংশ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন এই দুইখানি পুথির সহিত মিলাইয়া পড়া উচিত। তাহা করিলে, যে ভাবধারার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানিকে চতুর্দশ শতকের বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, তাহার জের উনবিংশ শতকেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, সঙ্গীতের দিক্ দিয়া এই অপূর্ব পুথিত্রয়ের সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস বড় বিচিত্র। পলাসীর যুদ্ধের পর হইতেই ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির নেতৃত্বে ইংরেজ সওদাগরেরা বাংলা দেশকেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র করিয়া যে অর্থলোলুপতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার একমাত্র শুভফল—বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যাহা সুরু করিয়াছিলেন, মিশনরীরা আসিয়া তাহারই বিস্তার সাধন করিলেন এবং ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই শিক্ষায় দীক্ষায়, সাহিত্যে সমাজে, এমন কি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে দ্রুত উন্নতি করিয়া বাঙালী ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া চলিল, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিল এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিত্তিও স্থাপিত হইল।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের ইতিহাস জানিবার জন্য এ যুগের বাঙালীর সহজ কৌতূহল আছে। কিন্তু এ যুগের কোন বিধিবদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস নাই। বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কীয় আন্দোলনের মধ্যে, অধুনা-দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং কয়েক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনী হইতে এই যুগের ইতিহাস আমাদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে। একটা মোটামুটি কাহিনী পাইতেছি বটে কিন্তু যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, কৌতুক-কৌতূহলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সকল বিচ্ছিন্ন উপকরণের মধ্যে বড়-একটা মিলিতেছে না।

গত যুগের এক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন ও স্মৃতিকথার সাহায্যে যুগের অন্তরতম রহস্যের খানিকটা সন্ধান আমরা জানিয়াছি, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ তাঁহারই জীবনী ও কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯২ বৎসর তিনি বাঙালীর জাতীয় মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক হিসাবে, বিস্মৃত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্র রূপে তাঁহার এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং তাঁহার বহুবিচিত্র কর্ম্মজীবনও আমাদের নিকট কম মূল্যবান্ নয়।

বংশ-পরিচয়

১৮৬৯ সনে কৃষ্ণকমল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "রামকমলের জীবনবৃত্ত" লিখিয়া 'বেকন'

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহ সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

১২৪০ শালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগান নামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতাবাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটী বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পর রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামজয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুরবগাহ পুরাণ গ্রন্থের রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ পায় নাই।...তিনি পুত্রের শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র, অমরকোষ অভিধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয়, তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র [কৃষ্ণকমল] বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহোদর অপেক্ষা বড় ছিলেন।।

---

* রামকমল ১৮৫৭ সনে নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬০ সনের ১১ই জুন তারিখে তিনি আত্মহত্যা করেন।

রামকমলের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণকমল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। আমি রামকমলের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাইয়াছি :—

(১) Bacon's Essays | Selected and | rendered | with | sundry adaptations | By | Ramkamal Bhattacharya. | বেকন | অর্থাৎ | তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ। | রামকমল ভট্টাচার্য্য | সংকলিত। | কলিকাতা | মৃজাপুর, ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন, ৯ নং ভবন। | গৌড়ীয় যন্ত্র। | ১৮৬১ | [পৃ. ৬৮+১ শুদ্ধিপত্র]

এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে আছে। ১৮৬৯ সনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (*The Calcutta Gazette* for 8 Dec. 1869) তাহার প্রথম ২৫ পৃষ্ঠায় "রামকমলের জীবনবৃত্ত" দেওয়া আছে। এই জীবনবৃত্ত কৃষ্ণকমলের রচনা। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নিকট দ্বিতীয় সংস্করণের 'বেকন' এক খণ্ড আছে।

(২) ইংলণ্ডের ইতিহাস। পৃ ১২৬। কলিকাতা ১৮৬১।

ইহাতে ৩য় জর্জের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৩) Elements | of | GEOMETRY | By | Ramkamal Bhattacharya. | Published after his death | With an English Translation. | জ্যামিতি। | রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। | Calcutta | The Presidency Press. | 1862. | [পৃ. ৩২+28+xx]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরিতে রামকমলের 'জ্যামিতি' আছে।

ছাত্রজীবন

আনুমানিক ১৮৪০ সনে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের সমবয়স্ক ছিলেন। ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর, বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।

ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি† মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম। এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল। অঙ্কের অধ্যাপক শ্রীনাথ দাস, ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি। (পৃ ৩৩-৩৬)

আসলে কৃষ্ণকমল আট বৎসর বয়সে ১৮৪৮ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া

---

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তিনি ১৮৪৩-৪৫ সনে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে প্রায় তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০ মে ১৮৪৬ তারিখ হইতে তিনি মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সনের ৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে আমি ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ ২৫-৩০) আলোচনা করিয়াছি।

† কৃষ্ণকমল স্মৃতিবিভ্রমের ফলে রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন) মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে গোবিন্দ শিরোমণির নাম করিয়াছেন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে সংস্কৃত কলেজের ৩য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে রামগোবিন্দ তর্করত্ন মাসিক ৪০৲ বেতনে ১ ডিসেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন, তৎপূর্ব্বে (জুলাই ১৮৩৭ হইতে) প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যের জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণকমল তাঁহারই শ্রেণীতে ১৮৫০ সনে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৫ জুন ১৮৫৬ তারিখে রামগোবিন্দ মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। ২৮ মার্চ ১৮৬০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে যে সংস্কৃত মহাভারত প্রকাশিত হয় তাহার ৮র্থ খণ্ডে (১৮৩৯) সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতির নামের সহিত তাঁহার নামও আছে।

গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি ১ জুন ১৮৩৯ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৪ তারিখ পর্য্যন্ত হিন্দু ল কমীটির পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসুস্থ হইয়া পড়িলে (এবং অবশেষে ২ মার্চ ১৮৪৫ পরলোক গমন করিলে) শিরোমণি মহাশয় ১১ জুন ১৮৪৪ হইতে ২৫ জুন ১৮৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত মাসিক ২৫৲ টাকা পারিশ্রমিকে অস্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬০-৬১ সনের ক্যালেণ্ডারে হুগলী কলেজের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহাতে কলেজ-বিভাগের হেডপণ্ডিত রূপে শিরোমণির নাম পাইতেছি।

যায়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটরী জে. ময়েট (Mouat) সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to report that since my letter No. 373 dated 25th January 1848 the undermentioned Students have been admitted in the Sanscrit College.

Names	Age in year	Class
*	*	*
Krishnacomul	8	4th Grammar Class

কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র, তিনি জুনিয়র সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।

১৮৫৭ সনে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঐ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষার পর ১৮৫৭ সনেই কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্চ, আমি বলি, তুমি মেডিকাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দেবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ ৩৭, ১১৯।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৯ জুন ১৮৫৭ তারিখে ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাক্‌শনকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to state that the three students of the Sanscrit College who passed at the last Entrance Examination are anxious to enter the Presidency College, two (1 Ramakhoy Chatterjee, 2 Shomanath Mookerjee) into the Law Class and one (Krishnakamal Bhattacharjee) into the General Branch I have therefore to request that you will be pleased to issue the necessary instructions for their admission into that Institution.

As all the three students hold Senior Scholarships* in the Sanscrit College I beg to recommend that they may be permitted to retain their in the Presidency College.

---

* কৃষ্ণকমলের বৃত্তি প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১ জুন ১৮৫৭ তারিখে ডি. পি. আই.-কে লিখিয়াছিলেন :—

Krishnacomal Bhattacharjee was on the receipt of 12 Rupees per month... during the last Session, but he has since become entitled to a higher scholarship of Rs. 16 per month...

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার কয়েক মাস পরে—১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।—এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' পৃ. ৪১।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে কৃষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞাপনটি এই :—

বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫।

১৮৬০ সনে কৃষ্ণকমল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এনট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ পাস দিয়াছিলাম. . । (পৃ. ১০৩)

এই পরীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাতে প্রকাশ :

2nd Class.

4th—Kristocomul Bhuttacharyya. Ex-student Sanskrit College

কর্ম্মজীবন

ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্

খুব সম্ভব ১৮৬০ সনের শেষ দিকে, ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্ উড্‌রো সাহেবের চেষ্টায় কৃষ্ণকমল ২৪-পরগণার দক্ষিণাংশের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলসের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সুতরাং আমাকে চাকরি করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন।

এই পদে তিনি অল্প দিনই নিযুক্ত ছিলেন। ১ জুন ১৮৬১ তারিখে ডি. পি আই-কে লিখিত ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্ উড্‌রো সাহেবের পত্রের সহিত কৃষ্ণকমলের একটি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanscrit, together with a critical, extensive, and profound acquaintance with English."—Extracts from the Report

of Baboo Krishna Comul Bhuttacharjee B. A., late Deputy Inspector of Schools, for the Southern part of the 24-Pergunnahs (Appendices to General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61. App A, pp. 58-60.)

খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা

কৃষ্ণকমল ১৮৬২ সনের প্রথম চারি মাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় ইহার উল্লেখ নাই। এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভার যে বিবরণ ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে কৃষ্ণকমলের খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতার কথা জানা যাইবে :—

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার [? ২৯ মে] খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিকী ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন।

...এই চারি বৎসর কাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।...

আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ... শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ··কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটা স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল

বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি সচ্ছন্দ শরীরে ও সচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

ইহার পর ১৮৬২ সনের মে মাসের শেষাশেষি কৃষ্ণকমল মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিখে বাংলা-সরকারের জুনিয়র সেক্রেটরী তাঁহাকে যে নিয়োগ-পত্র পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Assistant Professor of Vernacular Literature in the Presidency College on a salary of Rupees 200 Two hundred per mensem.

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ। ৩রা পৌষ বুধবার। পরিদর্শক সম্পাদক বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন. । আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়্দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী', মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।

কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ১০ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন, পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮৭৩ সনের ৮ই জানুয়ারি তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ জে. সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

> I have the honor to forward a letter from Baboo Krishna Komol Bhuttachargie B. A., Professor of Sanskrit of this College in which he

desires to resign his appointment from the 8th January with the intention of joining the Bar. The College is closed for the winter vacation from this date and will reopen on the 8th January. I therefore recommend that the Baboo be allowed to resign his appointment from that date I have received several applications for the post about to be vacated which I forward for your consideration. The salary of the Professorship is 300 Rupees and that of the assistant Professorship 200 Rupees a month

তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

সাপ্তাহিক সংবাদ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ।

ওকালতি

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকমল অল্প দিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং তৎপরে হাবড়া-কোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি, । (পৃ ১২০)

[বঙ্কিম বাবু] যখন হাবড়ায় ছিলেন, আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। (পৃ ৭২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণকমল ১৮৭৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৪ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্ত্তৃক 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনরারী ফেলো' নির্ব্বাচিত হন।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ

কৃষ্ণকমল ১৮৯১ সনে রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯০৩ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যালোচনা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কৃষ্ণকমলের বিশেষ দখল ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিযাছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিযাছেন :—

আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমাব প্রথম আলাপ হয়। তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলেমানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্ম আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি ?' (পৃ. ৮৪-৮৫)

সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন

১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এ-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

সে [সিপাহীবিদ্রোহের] সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা আডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১।

'বিচারকে'র প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন :—

'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্ম আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

১৮৯১ সনে* সাপ্তাহিক পত্র 'হিতবাদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সাপ্তাহিক

* কৃষ্ণকমল-সম্পাদিত ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা 'হিতবাদী' দেখিয়াছি। ইহার তারিখ ৮ আগষ্ট ১৮৯১।

পত্রের প্রথমাবস্থায় কৃষ্ণকমল কিছু দিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল, তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ ৭৬ ৭৭।

রচনা—পুস্তক ও প্রবন্ধ

আচার্য্য কৃষ্ণকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে যেগুলির সন্ধান আমরা পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হইল।

১। **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ**। পৃ. ৬২। ১৮৫৮ (?)

পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ ॥ | কলিকাতা। | ১৭৭৯ শকাব্দা | টামর্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। |

এই পুস্তকখানি ১৮৫৮ সনের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। আষাঢ়, ১৭৮০ শকের 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত করেন। সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটাও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

পুস্তকখানির আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন।…ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যে কৃষ্ণকমলেরই রচনা, ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতেও তাহা জানা যাইবে :—

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি। কালেজ ষ্ট্রীট নং ৮৬

প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে সে সকলের মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ সকল প্রয়োজন হইলে আমাদিগের গ্রন্থালয়ে পাইবেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বেকনের সন্দর্ভ (৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	।৵০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (ঐ কৃত)	।৹
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	।০
বিচিত্র বীর্য্য (ঐ কৃত)	॥৹

গুপ্ত ব্রাদর্শ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়— এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়া পদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা। আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আবৃষ্ট হইলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটা গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটাঘটাসজ্ঘটিত—এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটা ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটা বিভিন্ন সময়ে,* বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ

* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র দিক্ষিত-সম্পাদিত 'সুবোধিনী' পত্রিকা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ও ১৮৫৮ সনের গোড়ার দিকে প্রকাশিত—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উভয় রচনাই একই লেখনী-প্রসূত হওয়া বিচিত্র নহে।

হইল। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে, কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিসটরি হইতে সঙ্কলিত।—'বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ ৫২৫-২৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও তদন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে এক এক খণ্ড 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' আছে।

২। **বিচিত্রবীর্য্য**। পৃ সংখ্যা ৭৬। জানুয়ারি ১৮৬২।

ইহার আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bichitrabyrya | A | Heroic Tale | By | Krishnakamal Bhattacharya. | বিচিত্রবীর্য্য | নামক | বীররসাশ্রিত আখ্যান। | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য | প্রণীত। | কলিকাতা | গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত | ইং ১৮৬২ সাল |

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় হয় নাই ; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড পৃ ২০৩।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে (আখ্যাপত্রবিহীন), চৈতন্য লাইব্রেরিতে ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বিচিত্রবীর্য্য' আছে।

৩। **নাগানন্দম্**। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সহকৃতেন শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষেণ মুদ্রাঙ্কিতম্। পৃ সংখ্যা ৭৪+১৯। সম্বৎ ১৯২১ (১৮৬৪)।

ইহার এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে আছে।

৪। **কুমার সম্ভব**। প্রথম সাত সর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ। পৃ সংখ্যা ১০৮। ১৮৭৫।

ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

কুমার সম্ভব। | অর্থাৎ | মহাকবি কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্যের | প্রথম সাত সর্গের | বাঙ্গালা অনুবাদ। | বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফারস্‌ট্ আর্টস্ পরীক্ষার্থীদিগের | উপকারার্থে | প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি বি, এল কর্ত্তৃক | প্রণীত। | শ্রীহেমনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। | সন ১২৮২ সাল |

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'কুমার সম্ভব' আছে।

৪। *On some unsettled questions of Succession under the Bengal School of Hindu Law* Calcutta, 1877.

৫। *Tagore Law Lectures*—1884-85. The Law relating to the Joint Hindu Family. 1885.

৬। *Notes of Lectures on Hindu Law*. Calcutta, 1886.

৭। *The Institutes of Parasara.* Translated into English by Krishnakamal Bhattacharyya. (Bibliotheca Indica), pp. 82, Calcutta, 1887.

উপরের চারিখানি পুস্তক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

৮। *The Bhattikavya* for the use of the Students preparing for the First Examination in Arts ··Together with an elaborate Appendix by Umacharan Tarkaratna ··pp. 226+48+xviii. 1891.

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

৯। **কুমারসম্ভব।** পৃ. ৪৯৬। ১৮৯২।

ইহা ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে মুদ্রিত। 'ক্যালকাটা গেজেটে' মুদ্রিত পুস্তকের তালিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

১০। *Raghuvansam* Canto VI With the commentary of Mallinatha and Translations of Krishnakamal Bhattacharya, Principal Ripon College···1895.

১৯০৩ সনে, মল্লিনাথের টীকা-সমেত রঘুবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের ইংরেজী-বাংলা অনুবাদ কৃষ্ণকমল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১। **পুরাতন প্রসঙ্গ।** প্রথম খণ্ড। ১৩২০।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকে কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পাঠে কৃষ্ণকমলের সমকালিক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও অনেক কাজের কথা জানা যায়।

এই স্মৃতিকথায় প্রকাশ (পৃ. ২০২), তিনি "একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস" রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের রচনা।

'পূর্ণিমা', 'অবোধবন্ধু', প্রভৃতি তৎকালীন মাসিকপত্রাদিতে কৃষ্ণকমল বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন প্রবন্ধের শেষে বড়-একটা লেখকের নাম থাকিত না। এই কারণে আজিকার দিনে তাঁহার রচনাগুলি নির্ণয় করা দুরূহ। কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্ধান দিয়াছেন ; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম। ·ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ'* ও 'তাঁতিয়া টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাতে' আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই।··
>
> কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ ?] ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি ম্যাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত

---

* কবিতাটি "জুঁইফুল" নামে ৫ম সংখ্যা 'পূর্ণিমা'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই সংখ্যা 'পূর্ণিমা' আছে।

করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া'* গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত† বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।‡ ইহার পর 'ভারতী' পত্রিকায় আমি কয়েকটি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল।§

মৃত্যু

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগষ্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

কৃষ্ণকমল কোঁতের শিষ্য ছিলেন, তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আমি Positivist, আমি নাস্তিক।"

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে ('সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭) কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম:—

> কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.

[এই প্রবন্ধ সঙ্কলনকালে আমাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র দেখিতে হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই সকল নথিপত্র দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাচীন নথিপত্র হইতে দুইখানি পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।]

---

* 'পৌল ভর্জ্জীনী'—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫, পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন। ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা। কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত। আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল!"

† "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

‡ "ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

§ "Positivism কাহাকে বলে?"—'ভারতী', শ্রাবণ, আশ্বিন ১২৯২।

"বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না"—'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৪।

"জান্তব চুম্বক শক্তি"—'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৮।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় যে সূত্রপাত পদ্যে, গদ্যের আবির্ভাব পরে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কোনও দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা পদ্য হইতে ক্রমশঃ গদ্যে রূপান্তরিত হয়, সর্ব্বত্র লোকে বরাবরই গদ্যেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে—ভাষা ও সাহিত্য লিখিতে গেলেই স্বভাবত প্রথমে ছন্দ ও মিল বাহন হইয়া বসে। লেখনীমুখে মানুষ গদ্যের সাহায্যে পরে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়।

প্রাচীনতম বাংলা চর্য্যাপদকে যদি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য ইহার ঠিক ৮৫০ বৎসর পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কর্ত্তৃক রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত। বাঙালী যে গীতিপ্রধান কবির জাতি, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ; অন্য কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস। বাংলা গদ্যের ভাষা তখন পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিবার মত সামর্থ্য অর্জ্জন করে নাই, যে অবসর এবং মনের উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দান করে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যতাকে অতিক্রম করিয়া অসামান্য কল্পনালোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান জোগাইয়া তাহাকে মহত্তর জীবনের পথে লইয়া যায়, বাঙালী তখন মঙ্গলকাব্য, টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় সেই অবসর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল। তাম্রশাসন, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে নিতান্ত মামুলি প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল, এই পর্য্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'একটা আষাঢ়ে গল্পে' নিরুপদ্রব তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ আগমনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই রূপক বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খাটে। সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

ইতিহাসের উপকরণ

বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের পূর্ব্বেকার একটা ইতিহাস আছে, তাহা সমসাময়িক ও প্রামাণিক নয়; পূর্ব্বগামীরা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর সাহায্যে এই যুগের যতটুকু পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপজীব্য। যে যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের খোলস সদ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধচর্য্যাপদ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভাষায় পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, অনুমান করা ছাড়া তাহা জানিবার আজ উপায় নাই। ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য। এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষ দলিলের উপর গঠিত নয়, যে সকল উপকরণের উপর ইহার নির্ভর, সেগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গোপনে সুরক্ষিত অথবা একেবারেই অস্তিত্ববিহীন, চেষ্টা করিলেও চোখে দেখিবার উপায় নাই। নকলের নকলে বহুলপ্রচারের ফলে এগুলিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের এইখানেই বিপদ। এই তমসাচ্ছন্ন যুগের ভাষার ও বাক্যগঠন-রীতির নমুনা হিসাবে যাহা সচরাচর দাখিল করা হইয়া থাকে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিলে সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হইবারই কথা। যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই।

আসলে ইতিহাস বস্তুটা আমাদের ধাতস্থ নয়। যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণ-কাহিনীতে পর্য্যবসিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস না থাকিবারই কথা। বিশেষ করিয়া, বাংলা ভাসা ও সাহিত্য দেশের পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বহু বিলম্বে। বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্‌রিগণই গোড়ার দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও মাসিক 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক ও পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থলেই ইতিহাসের সূত্রপাত। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮) ৫৯ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষার ইতিহাসের গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত পত্রিকার কোয়ার্টারলি সিরিজ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১-এর ১ম সংখ্যায় ও ১৮২৫-এর ১ম সংখ্যায় "On the effect of the Native Press in India" ও "On the progress and present state of the Native Press in India" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের ও বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাচার পত্রিকার সকল প্রকাশ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মাসিক ও ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলিতে এবং 'সমাচার দর্পণে' তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি বাংলা পুস্তকের

বিষয়বস্তু রচনাভঙ্গী ও লেখক সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বহু উপকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' ত্রৈমাসিকেও রেভারেণ্ড লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধে এবং পত্রিকাশেষে সন্নিবিষ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক-সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে। রেভারেণ্ড লং, জে. ওয়েঙ্গার, জে. মার্ডক প্রভৃতিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়া ইতিহাস-রচনার বহু উপকরণ জোগাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশ হইতে 'ক্যালকাটা গেজেটে'র লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে সেই বৎসর হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইতেছে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হইতে সুরু করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত এই আঠার বৎসরের ইতিহাস অতিশয় মূল্যবান। ডক্টর সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে এই যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণ করেন। এই উভয়ের, বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর যত্নলব্ধ গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে যে কেহ এই যুগের ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের উপকরণ এখনও পর্য্যাপ্ত নয়।

মুদ্রিত ইতিহাস

সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কুমারটুলি ১৯ নং জয়মিত্র ঘাট লেনের মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকে ভুল করিয়া 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্নকে প্রথম ইতিহাস রচনার সম্মান দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal* পুস্তক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। 'জাতীয় সভা'য় প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেজভবনে প্রদত্ত গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র বাৎসরিক উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক প্রকাশ করেন। পদ্মনাভ ঘোষালের কোনও ইতিহাস আমরা দেখি নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ধারাবাহিকভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (দশম কল্প, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ) এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় (১৮৭১ খ্রীঃ) বেনামীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী* প্রকাশ করেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দি লাইফ এণ্ড টাইমস অব কেরী মার্শম্যান এণ্ড ওয়ার্ড' পুস্তকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাহাতেও কিছু উপকরণ আছে।†

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বিগত দশ বৎসরের মধ্যে, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। ইহার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', ১৯১৩ ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্য্যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' ১ম খণ্ড, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800—1825*, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড, 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১-৯—এই কয়খানি পুস্তকই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ সম্পর্কে এমন পরস্পরবিরোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা কঠিন। অধ্যবসায় এবং

---

* "Bengali Literature", pp. 294-316.

† কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫ খ্রীঃ), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিচরিত' (১৮৬৯ খ্রীঃ) এবং 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রভৃতি পুস্তকে ইতিহাসের উপাদান থাকিলেও ঠিক ইতিহাসের পর্য্যায়ে এগুলিকে ফেলা চলে না।

উপকরণের অভাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই ভ্রান্ত এবং কল্পিত বিবরণী দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে এই যুগের একটা সত্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের *History of Bengali Language and Literature* পুস্তকের ৮২৮ হইতে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বাংলার প্রাচীনতম গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মূলত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত অষ্টাদশ ভাগ 'বিশ্বকোষে'র (১৯০৭ খ্রী:) "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক আলোচনা হইতে গৃহীত। বস্তুত পরবর্ত্তী কালে এই 'বিশ্বকোষ'কেই কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ২য় বৎসরে (১৮৯৫ খ্রী:) রজনীকান্ত গুপ্ত "বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য" (পৃ. ৩০-৫০) নাম দিয়া এক বিস্তৃত নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনায় সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* পুস্তকের Appendix I (পৃ. ৪৫৫-৮৬)-এ প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের আর একটু সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র-সম্পাদিত *Types of Early Bengali Prose* (১৯২২ খ্রী:) পুস্তকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের অনেক নমুনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেদারনাথ মজুমদার-প্রমুখ কয়েক জন কেবলমাত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪ খ্রী:) ও শ্রীযুক্ত জহরলাল বসুর 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৩৬ খ্রী:) অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু উপকরণের অভাবে এ ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ নয়। বহু পরস্পরবিরোধী কথাও আছে।

এই বহুল পরিমাণে কল্পিত ও পরস্পরবিরোধী উপকরণের মধ্য হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজ নয়। অধুনা-অজ্ঞাত উপাদানে ও পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া গেলে আমরা যেমন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে পারি, তদ্দ্বারা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা

প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development* পুস্তকের ভূমিকায় "Oldest Remains of Bengali" শীর্ষক আলোচনা হইতে (পৃ. ১০৮-১৩৫) গোড়ার কয়েকটি কথা সঙ্কলন করিতেছি।

১। সংস্কৃত→প্রাকৃত→অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম।

২। উড়িয়া, আসামী ও বাংলা সমগোত্রজ।

৩। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীনতম বাংলার নমুনা—

(ক) কয়েকটি শিলা ও ধাতু লেখে এবং প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত স্থানের নাম। পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এগুলির সূত্রপাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা এই নামগুলিকে সংস্কৃতরূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

(খ) বন্দ্যঘাটীয় বাঙালী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ-কৃত (১১৫৯ খ্রীঃ) 'অমরকোষে'র টীকায় ('টীকাসর্ব্বস্ব') ত্রিশতাধিক বাংলা শব্দ। এই গ্রন্থ বাংলা দেশে লুপ্ত হইয়া মালাবার অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় রায়-বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ("সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলা শব্দ") ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ("দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ") এই শব্দগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত ৪৭টি চর্য্যাপদ। এগুলি শাস্ত্রীমহাশয়-সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', (১৯১৬ খ্রীঃ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৪। ইহার পরেই বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও রমাই (বা রামাই) পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' উল্লিখিত হইয়া থাকে। এগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় বিরচিত গ্রন্থের কয়েকটি গানকে বাংলা বলিয়াছেন, এগুলি ৯০০ হইতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। শিখেদের 'আদিগ্রন্থে' দুইটি পদ জয়দেবের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, কাহারও কাহারও মতে তাহাও প্রাচীন বাংলায় রচিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কেও অনেকে প্রাচীন বাংলা হইতে পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত বলিয়া মনে করেন। জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি।

৫। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

৬। ১৫০০ খ্রীঃ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নয় শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই। খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়া বাংলা ভাষার জন্ম হইতে (৯০০ খ্রীঃ) উক্ত ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ।

কিছু শিলালেখ ও তাম্রশাসন, কিছু দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র, কয়েকটি গ্রন্থের অংশ এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ সহজিয়া পুথি এই যুগের গদ্যের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত ও

প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,* তাঁহাদের সকলেরই মূল অবলম্বন 'বিশ্বকোষে'র "প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রবন্ধ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র নানা প্রবন্ধেও বহু নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল উপকরণের প্রামাণিকতা নির্ণয়ের উপায় নাই। এইগুলিকে বিশ্বাস করিলে এই যুগের বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিচ্ছিন্ন রূপ ধারাবাহিকভাবে এইরূপ দাঁড়ায়:

চণ্ডীদাসের 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণান্তর্গত 'বারমাসি' প্রভৃতি গদ্যাংশ বাংলা গদ্যের আদিমতম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাস ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাদের লোক, শূন্যপুরাণ (যাহা আমরা মুদ্রিত আকারে পাইতেছি) সপ্তদশ শতকের রচনা। তাহা হইলে প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা তারকেশ্বর মোহন্তের প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের পেপার-বুক হইতে জহরলাল বসু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত (পৃ ২৫) হইয়াছে। ইহা রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত একটি ছাড়পত্র, ৭৮৫ সালের ১০ই চৈত্র লিখিত, ইংরেজী ১৩৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই পত্রের একটি ফটো-প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হওয়া উচিত। পত্রটি এইরূপ—

॥ শ্রীশ্রীরাম

স্বাস্ত সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পুত্রহ মিদং কাযানন্দাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভক্তপুর নাগাদী শাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি শালীগুনা চন্দ মহচুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধুম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া [রা ?] জুতিয়া যোতাঁয়া শ্রী শ্রী৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

শ্রীরাজা ভাবামল্ল রায় [নাগরীতে]

রায়বাব কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে আদি-যুগের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন ...

কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি। ইত্যাদি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য; আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস [পদকল্পতরু-কার] কবিবন্দনাস্থলে.. লিখিয়াছেন.

---

* বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৮ ভাগ, পৃ. ১৮৮-১৯৬, দীনেশ সেন—Bengali Language and Literature, ১৯১১, পৃ ৮২৮-৮৪৪, ঐ—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৫-৫৭০, ঐ 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় ভাগ, পৃ ১৬৩০-৪৩, ১৬৫৫-৫৬, ১৬৭২-১৬৭৯, শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose, ১৯২২; সুশীল দে—Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1919, পৃ ৪৫৫-৮৬; জহর বসু—'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১৯৩৬, পৃ. ২০-৫৪।

জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপম।
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত। [পৃ ৭২-৭৩]

সুতরাং চণ্ডীদাস যে গদ্য লিখিয়াছিলেন এই বিশ্বাস বহুদিন হইতেই চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ'-কার চণ্ডীদাসকৃত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি'র পরিচয় দিয়াছেন—"ইহার যে সকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত।" ভাষার নমুনা এইরূপ—

চৈতরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি। জিহু রজকিনী তিহু রাগমই। রাগ আত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহু চেতনরূপ তিহু চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা' গদ্যে লিখিত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষা এইরূপ—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে। পূর্ব্বরাগের মূল দুই হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম, রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা'টিও কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শূন্যপুরাণের যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুস্তকটি মূলত পদ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ভাঙা গদ্য-রচনা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে পুথি হইতে ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন তাহা সপ্তদশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মনে করেন—

……the so-called prose passages, if not the verse, reveal a much earlier and more antique form of diction. If the language of the recently published *Sri Krsna Kirtana* belongs to the early part of the 14th century, we can safely assume that the prose of *Sunya Puran* must have had its origin in a somewhat earlier age —*Bengali Literature in the Nineteenth Century*, p. 457.

এই উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে শূন্যপুরাণের ভাঙা গদ্যকেই প্রথম বাংলা গদ্যের গৌরব দিতে হয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর স্বর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাং কল্লি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি।

এইগুলি ব্যতীত শ্রীনীলাচলদাস-কৃত 'দ্বাদশপাট নির্ণয়', কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'রাগময়ীকণা' ও 'আলম্বনচন্দ্রিকা' নরোত্তম দাসের 'রাগমালা' ও 'শিক্ষাপটল' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিম্ননামাঙ্কিত পুথিগুলি 'বিশ্বকোষ' কর্ত্তৃক বাংলা গদ্যের এই অন্ধকার-যুগের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

আশ্রয় নির্ণয়, আত্মজিজ্ঞাসা, দাস্যাদ্যষ্টভাবার্থ, উপাসনাতত্ত্ব, সিদ্ধতত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মিকা, আত্মসাধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ, চন্দ্রচিন্তামণি, আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার, তিন মানুষের বিবরণ, সাধনাশ্রয়, সিদ্ধান্তটীকা, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, উপাসনানির্ণয়, স্বরূপবর্ণন, দেহকড়চ, চম্পককলিকা, আত্মতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, পঞ্চাঙ্গনিগূঢ় তত্ত্ব, হরিনামের অর্থ, গোষ্ঠীকথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসাপ্রণালী, জবামঞ্জরী, ব্রজকাবিকা, রসভজনতত্ত্ব ইত্যাদি।

এগুলির ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই এক, যে কোনও পুথির নমুনা দিলেই সাধারণভাবে ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। 'ব্রজকারিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষে দুই শাখা নিকসিল। সে কে কে ? এক সখীভাব আর শাখাবিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নিকসিল। এই দুই শাখাবৃক্ষ উজ্জ্বল হইল। তাহার ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।

এই অন্ধকার-যুগের শেষের দিকে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা তখন রূপ লইয়াছে, নিতান্ত খাপছাড়া বা ভাঙা ভাঙা সন্ধ্যাভাষা নয়। গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ।

১। বৃন্দাবনপরিক্রমা। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে তাহা ১২১৮ সালে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন এই পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল।

২। বৃন্দাবনলীলা। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ভাষা প্রাঞ্জল।

৩। বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়।

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত তাহার তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৮১। সম্ভবত উহা ঐ নামীয় সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ।

৫। জ্ঞানাদি সাধনা। পুথির তারিখ ১১৫৮ বঙ্গাব্দ। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৪১ পৃষ্ঠায় 'সাধনা কথা' নামে উল্লিখিত।

৬। ব্যবস্থাতত্ত্ব।

৭। স্মৃতিকল্পদ্রুম।

৮। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ।

৯। দেব ডামর তন্ত্র।

১০। পাচনসংগ্রহ।

১১। কবিরাজী পাতড়া।

১২। কামিনীকুমার। দীনেশবাবুর বিবেচনায় ইহা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

১৩। কুলজীপটী ব্যাখ্যা।

১৪। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অংশত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অন্ধকার-যুগের কথা শেষ করিতেছি।

গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবং পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

এই সকল পুথি ও পুস্তকের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে বাংলা গদ্যের বয়স যথেষ্ট বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রদর্শিত নমুনাগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকগুলি নমুনা হইতে সন্দেহ হয়, সেগুলি গদ্য নয়, গুহ্যসাধন-সম্পর্কিত (সন্ধ্যাভাষায়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের মতে, এগুলি বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের যুগের নমুনা। আমাদের মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথ্য গদ্য ভাষার সহিত ইহাদের সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী লোকের পরম্পর জানিত ইঙ্গিত—পরবর্ত্তী কালের বহু সহজিয়া পুথিতে এই ভাষারই ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল দুর্ব্বোধ্য শব্দ লইয়া আলোচনা সমীচীন হইবে না।

অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয়

তারিখ-সম্বলিত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে ৭৮৫ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বোদ্ধৃত ভারামল্ল রায়ের ছাড়পত্র হইতে সুরু করিয়া হালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) ১১৮৫ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক যুগ। ভারামল্লের ছাড়পত্রের পরই প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক আহোম বা আসামরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে (ওরফে খোঁড়া রাজা) লিখিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'আসামবন্তি' পত্রিকায়* ইহা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয, পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় (গৌরীপুর) অধিবেশনের সভাপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ) অভিভাষণে (কার্য্যবিবরণী, ৩৭ পৃ.) এই পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রটি এইরূপ—

স্বস্তি সকলদিগ দন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণপ্রচালতহিমকরহারহাসসকাশকৈলাসপাণ্ডবযশোরাশি-বিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীষণপ্রচণ্ডধীবধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারসকলাদিক্‌কামিনী-গীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বাৰ্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।

---

* আসাম, তেজপুর হইতে প্রকাশিত।

তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান অধিক কি লেখিম।৵ সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উত্তগু চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধমু ১ চেঙ্গর মংস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।

১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে কোনও আসামী নৃপতি-লিখিত একখানি পত্রও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের 'আসামবন্তি'তে "ঐতিহাসিক চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য।

স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার ক্ষিঞ্চিং মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অন্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।...

অষ্টাদশ শতকে বাংলা-গদ্যের ভাষা একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত পুরাতন পত্র ও দলিলাদি যাহা কিছু বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদে তাহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র ১৬৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬৮৯ ও ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত দুইখানি পত্র মুদ্রিত আছে, কিন্তু এই পত্রগুলির মূল ও তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও পরিচয় দীনেশবাবু দেন নাই। সপ্তদশ শতকের বাংলা-গদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা কাগজপত্র হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফটোগ্রাফ করিয়া আনিয়া ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তৃতীয় সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১১২) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র। ১১০৩ সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। চুক্তিপত্রটি এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণ | সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসয়েষু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর খ বিকরি সকরাত ২ ঘ ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান

সুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত '৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্পেরও নকল আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গল্পটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোডষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পর্য্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রুপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা সুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক২ রাজার পুত্রকে এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোন কে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল কন্যা : আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়ে : এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয়। সে : সেইরুপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পাবে না : সকালে উঠে : রাজপুত্র : ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না : কতমং প্রকার করিলেক তবু : কন্যাকে : কথা কহাইতে পারিলেক না।…

১১৭৮ সালের (ইংরেজী ১৭৭১) ২৯শে পৌষ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি পত্র ইতিহাসের দিক্ দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। মহারাজ নন্দকুমার ইহা পুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন।

প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরঞ্চ : ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত মেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে॰ লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা২ জাউন গলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ভাষার নমুনা-স্বরূপ আরও অনেকে অনেক চিঠিপত্র ও দলিল প্রকাশ করিয়াছেন। সবগুলি প্রায়ই একই রীতিতে লিখিত সুতরাং প্রত্যেকটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রিত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে এই জাতীয় একটি পত্র আছে। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা প্রয়োজন।

৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওাজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্তী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১০৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবন

ফিদবি

জগতধির রায়

এই নমুনাটুকু হইতেই প্রাক্‌-আধুনিক যুগের বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। মূল কাঠামোটি বাংলা হইলেও আরবি ও পারসি শব্দের প্রয়োগবাহুল্যে ইহা প্রায় দুর্বোধ্য, অথচ আরবি ও পারসি শব্দে বাংলা প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্ত্তুগীস প্রভাব

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি'র 'রা অক্ষরে রাগ লাড়ি' অথবা 'শূন্যপুরাণে'র 'হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি' হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিউক্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'তোরফেনকে তলব দিয়া' পর্য্যন্ত ভাষার একটা প্রগতি ও ধারাবাহিকতা প্রায় অব্যাহত আছে। বাংলা-গদ্যের উহাই মূল ধারা। এই ধারাই পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, অন্ততঃ আজিকার দিনে ধারাবাহিকতার দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে বসিয়া ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাকে আকস্মিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আকস্মিক না হউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই ব্যাপারের মুদ্রিত দলিল আছে, 'অন্ধকার যুগ' এবং 'চিঠিপত্র ও দলিলের যুগে'র মত আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এবং এই কারণেই আমরা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রাথমিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়াছি।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র করিবার অথবা সাধারণ ধারার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত এবং এই আলোড়নের তরঙ্গ সীমাবদ্ধ কাল ও দেশে পরিসমাপ্ত। এই আলোড়নের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে আরম্ভ এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত, ইহা সম্পূর্ণ পোর্ত্তুগীস প্রভাবের ফল। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে বাংলা ভাষায় যে কিছু কাজ হইয়াছিল সমসাময়িক চিঠিপত্রে ও বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

১। Father Marcos Antonio Santucci, S. J, the Superior of the Misson among these Bengali converts between 1679 and 1684, wrote from Nolua Cot to the Provincial of Goa on January 3, 1683 : "The Fathers [Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself] have not failed in their duty : they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers, they have translated the Christian Doctrine [*Doutrina Christa* or Catechism], etc., nothing of which existed until now." [*O Chronista de Tissuary*, Goa, vol. II., 1867, p. 12.)—Father Hosten in *Bengal : Past & Present*, Vol IX, Part I, p. 46.

২। "১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেসুইট-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রচারক Francisco Fernandes ফ্রান্সিস্কো ফেরনান্দেস্ পূর্ব্ব-বঙ্গে সোনারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ Nicolas Pimenta নিকোলাস পিমেন্তা-র নিকট একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফেরনান্দেস্ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং ফেরনান্দেসের সহকর্ম্মী পাদ্রি Dominic de Souza দোমিনিক্-দে-সুজা বাঙ্গালাভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক, পৃ ।/০

৩। "Father Barbier, as early as 1723, mentions that he prepared a little catechism in Bengali."—শ্রীসুশীলকুমার দে, *Bengali Literature*, p 68.

৪। ১৫৯৯ সালে দোমিনিক সোসা নামক আর এক জন যীশুট যাজক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ("Sosa endeavoured to learn the Bengalan Language and translated into it a tracte of Christian Religion in which were confuted the Gentile and Mahumetan errours to which was added a short Catechisme by way of Dialogue, which the children frequenting the schoole learned by heart" —*Purchas His Pilgrimes*, Vol. X. p. 205) ··১৫৯৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাধিক খ্রীষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ', প্রস্তাবনা, পৃঃ ২।/০-২৷৵০

কিন্তু এই সকল রচনার অধিকাংশই আজও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তিনটি মাত্র গ্রন্থ আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য পুস্তক দুইখানি—

(ক) Crepar Xaxtrer Orth, Bhed | Xixio Gurur | Bichar | Fr Manoel | da Assumpcam | Liqhiassen, O buzhaiassen Bengallate | Baoal dexe, Xonhazar Xat Xoho pointix bossor | Christor Zormo bade | Bhetton | corilo boro Tthacurque | D. Fr Miguel | de Tavora | Evorar Xohorer Arcebispo | + Lisboate | Francisco | da Sylvar Xaze | Patxaer quitaber Xap | cornia | Xpor Zormo bossore 1743 | Xocol Uchiter hucume.

এই পুস্তকের এক খণ্ড ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এভোরার লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি তাহা লিসবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। একটি খণ্ডিত পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।

১। "The Three First Type-Printed Bengali Books"—H Hosten, S. J., *Bengal: Past & Present*, Vol IX. Part I, July-Sept, 1914, pp. 40-63.

। "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক"—শ্রীসুশীলকুমার দে, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ত্রয়োবিংশ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ. ১৭৭-১৯৫।

৩। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৭-২১৭।

৪। *Bengali Literature in the Nineteenth Century*—S. K. De, 1919, pp. 67-75.

৫। 'পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্-সুম্প্‌সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, 'প্রবেশক' ও 'প্রবেশকের পরিশিষ্ট'। পৃ. ১০-৩৮০

৬। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৩৭, 'প্রস্তাবনা' পৃ ১১০-৩১০।

এই পুস্তক কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবন্ধ-লেখকের সম্পাদনায় বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা সহিত বাহির হইতেছে।

(খ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত।

এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে। ফাদার হস্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; শ্রীযুত সুরেন্দ্রবাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি এভোরাতে ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই দেখিয়াছেন এবং মূল পুথির ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়া ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছাড়া এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। "প্রস্তাবনা" দ্রষ্টব্য।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৯১, গ্রন্থের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পোর্ত্তুগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—সুতরাং বাংলা অংশের পরিমাণ ছাপার অক্ষরে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মতন। টাইটেল পেজে গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে পাদ্রী মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ-এর নাম আছে। ইনি পোর্ত্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্ব্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রমাণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই পুস্তক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে লিখিত হয়। মূল পোর্ত্তুগীস অংশ মানোএলের লেখা, তিনি সম্ভবতঃ কোনও দেশীয় খ্রীষ্টানকে দিয়া বাংলা

অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রী ফাদার গেরে (Guerin) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র একটি বিশুদ্ধীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইযা পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁহার অজ্ঞাতে খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত—অনেক ক্ষেত্রে মূল পোর্ত্তুগীসে ও অনূদিত বাংলায় মিল না থাকার ইহাই কারণ। পাদ্রী গেরে'র উক্তি সত্য হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তকের রচয়িতা কোনও অজ্ঞাতনামা দেশীয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান—ভাওয়ালের কোনও অধিবাসী। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' পুস্তকের "প্রস্তাবনা" হইতে জানা যায়, "১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থালয়ে (*Bibliotheca Nacional*) প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে।"

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর রচিত। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ ইহা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের'ও পূর্ব্বের রচনা এবং ইহা নিঃসন্দেহে বাঙালীর রচনা। ভূষণার রাজপুত্র বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেদের দ্বারা অপহৃত হইয়া আরাকানে নীত হন। সেখানে ফাদার মানোএল দো রোজারিও নামক এক জন সেণ্ট অগস্তিন মণ্ডলীর ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী কালে ইঁহার প্রচারে ও প্রভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে' এক জন ব্রাহ্মণ ও এক জন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্ট-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার সহিত ইহার ভাষা খুব বেশী পৃথক্ নহে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার নমুনা—

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপি না, তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গেরে যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি তাহা তুমি শোন, সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।—পৃ. ৫৪

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'র নমুনা—

ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশর এমত করেন, কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেত্তো কালের পাপে করমাক্তিতে লওয়াএ।—পাণ্ডুলিপি পৃ ৬

১৭৪৩—১৭৭৮

ইহার পরেই বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা-রচিত দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেণ্টো সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা ও বাণ্ডেলে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় পনর বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন প্রেয়ার' ও 'ক্যাটিকিজম' পুস্তকের অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার পুস্তক দুইটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে রোমান্ অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। 'বিশ্বকোষে' শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'প্রশ্নোত্তরমালা'র প্রকাশ-তারিখ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসুশীলকুমার দের মতে ইহার প্রকাশ-কাল আর কয়েক বৎসর পরে। এই দুইটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও আমরা জানি না। বেণ্টোর পুস্তকের সন্ধান এবং ভাষার নমুনাও কেহ দেন নাই।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি

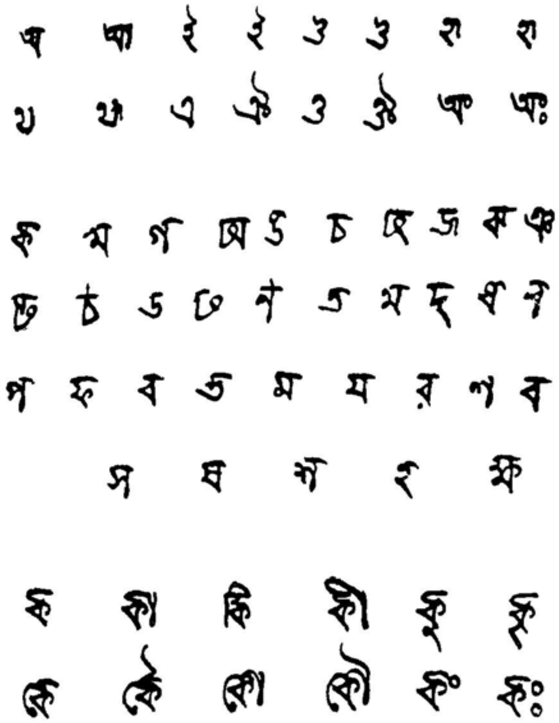
(১৬৯২-১৭৭৬)

এ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ব্যতীত তাহার কোনটিরই মুদ্রিত প্রমাণ নাই, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা উপকরণস্বরূপ কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি, চিঠিপত্র ও দলিল মাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলা-গদ্যের আলোচনা সম্পর্কে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি, মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপার হরফের ইতিহাস আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখন পর্য্যন্ত আলোচনাই হয় নাই। ডক্টর জি এ গ্রিয়ারসন্ তাঁহার বিখ্যাত *Linguistic Survey of India*, 1903, পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে "Specimens of the Bengali and Assamese Languages" প্রসঙ্গে (পৃ. ২৩) বাংলা অক্ষর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ('বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—প্রবেশক) এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেন।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন ফাদার এইচ. হস্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।* মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের কথা বলিতেছি, কারণ শিলা ও তাম্রলিপিতে, তাল-

* "It was published with a Burmese alphabet in 1692 in a work containing observations by the Jesuit Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienne Noel and Claude de Beze The title of the book is *Observations Physiques et Mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection*

পাতায় এবং তুলোট কাগজে বাংলা অক্ষর বহুকালাবধি খোদিত বা লিখিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ইতিহাস ১২০০ বৎসরের কম হইবে না। বাংলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপ্‌ৎসিক নগরে মুদ্রিত Georg Jacob Kehı (গেওর্গ্ য়াকোব্ কের্) প্রণীত লাটিন ভাষায় *Aurenk Szeb* নামক পুস্তকে।

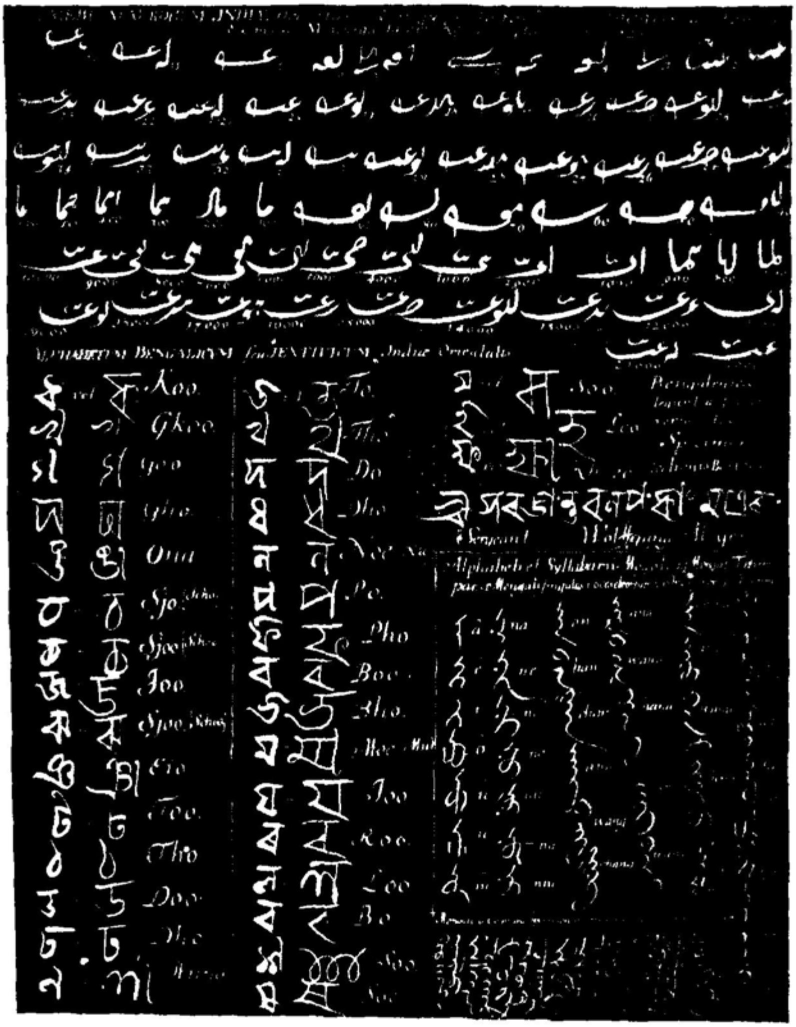


১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা

এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত বাংলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখের প্লেটে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্ম্মান নাম "শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর" (Sergeant Wolff-gang Meyer) বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের এই চিত্রটিই পরে (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) লাইপ্‌ৎসিক নগর হইতে মুদ্রিত যোহান ফ্রীদ্‌রিখ্ ফ্রিৎস্ (Johann Friedrich Fiitz) লিখিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' (*Orientalischer und*

---

de l'Astronomie et de la Geographie · *Envoyees des Indes et de la Chine a l' Academie Royale des Sciences a Paris, per les Peres Jesuites. Avec les reflexions de Mrs. de l' Academie, et les Notes du P. Gouye, de la Compagnie de Jesus.* A Paris, de l' Imprimerie Royale, M.DC XCII ; 4°, pp. 113, 2 maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas [Burma].—*Bengal · Past & Present,* vol. ix Part I, p. 40.



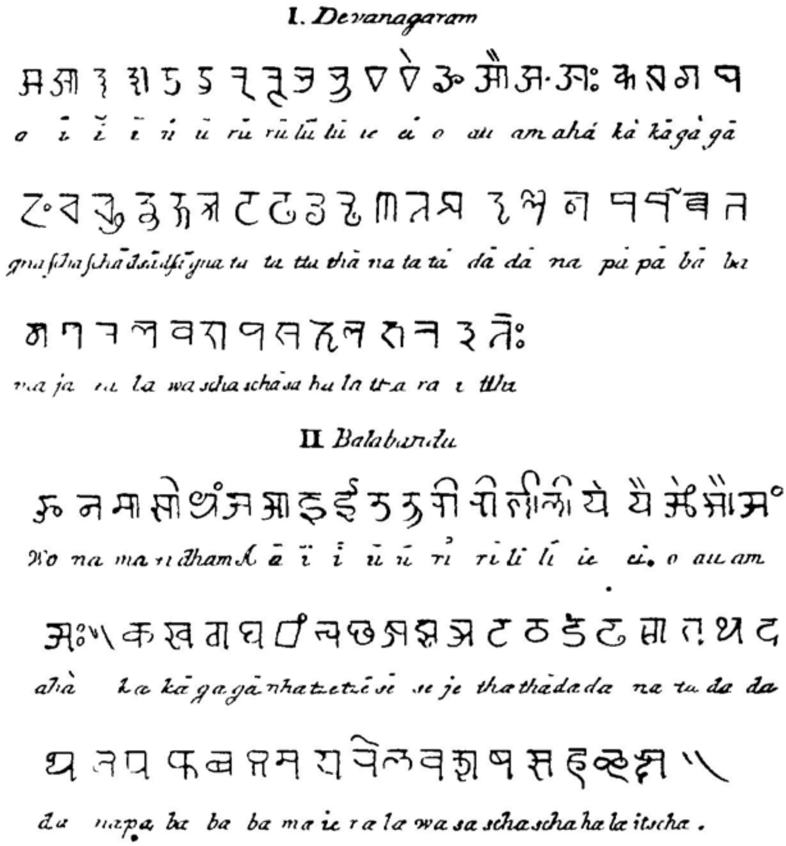
১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি



Alphabetum Brahm. III B

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি

Occidentalischer Sprachmeister) নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়। বাঙালী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা বাংলা অক্ষরের এই আদি নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।



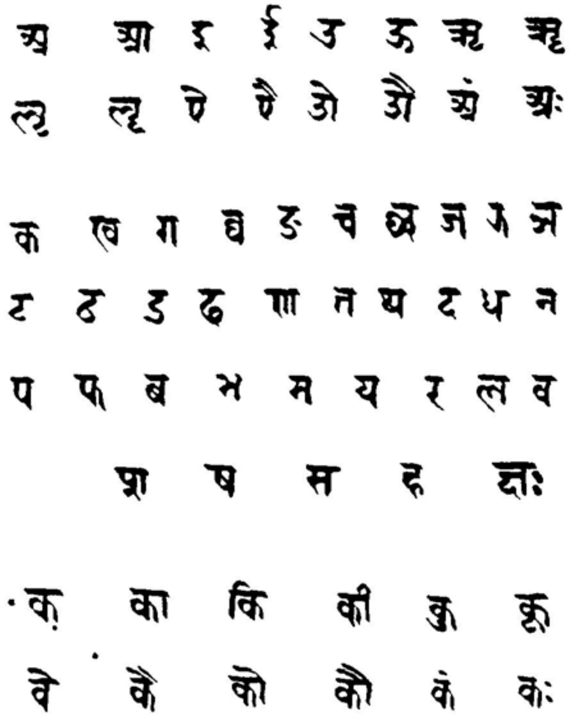
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড্ মিল (Davidis Millius) *Dissertationes Selectae* নামক (লাটিন ভাষায়) একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে Joannes Josua Ketelaer লিখিত 'Miscellanea Orientalia' নামক হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণ-অংশে বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে ছাপা আছে। এখানে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।*

---

* ডেভিড্ মিলের পুস্তকের এক খণ্ড ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পুস্তকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। Georg Jacob Kehr প্রদত্ত নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছি।—লেখক।

কেটেলের নিজে ওলন্দাজ ছিলেন এবং তিনি ওলন্দাজ ভাষাতেই তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন। ডেভিড্ মিল লাতিন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেটেলের প্রণীত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয় নাই।



১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড্ মিল তাঁহার লাতিন ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।

"আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি—ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে। টেব্‌ল III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা [অর্থাৎ বাংলা] প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।"

বাংলা বর্ণমালা কোনও কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত কি না ভাষাতত্ত্ববিদ্দের তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

মিল-প্রদত্ত দেবনাগর বর্ণমালা তেমন সুষ্ঠু নয়। সম্ভবতঃ লেখকের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্খের (Athanasius Kircher) লিখিত *China Illustrata* পুস্তকে দেবনাগরী বর্ণমালার সর্ব্বপ্রথম প্রতিলিপি পাওয়া যায়।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড অনূদিত *A Code of Gentoo Laws* পুস্তকে দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে বাংলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। তাহার প্রতিলিপিও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফের জন্ম। এবং তখন হইতেই বাংলা গদ্যের উন্নতির সূত্রপাত। ক্রমশঃ

মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডী-লিট

(প্রথম)

ছয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ ভারতে রাজত্ব করেন, এবং তাহার পরও কিছু দিন শাসনকার্য্যে মুসলমান-যুগের সরকারী ভাষা ও পদ্ধতি চলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ কালে মুসলমান রাজা ও সমাজ হইতে ভারতবর্ষ কতকগুলি দান পাইয়াছে যাহা আমাদের জাতীয় জীবনে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং এখনও শেষ হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা একটি মিশ্র পদার্থ, ইহার ক্রমবিকাশে মুসলমান-যুগের কৃতিত্ব কম আদরের নহে, কারণ ঐ ছয় শত বৎসরের শাসনের ফল ভারতবাসীদের দেহের, মনের অংশ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিক্ দিয়া আমরা মুসলমান-যুগের আনীত পরিবর্ত্তনগুলি ভোগ করিতেছি, কিন্তু আজ তাহার একটি মাত্র আলোচনা করিব।

আমার মনে হয়, মুসলমান জগৎ ভারতকে যে দানগুলি দিয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাস-সাহিত্য একটি প্রধান। এটি ভারতের পক্ষে অপূর্ব্ব। আমরা দম্ভ করিয়া বলি, হিন্দুযুগে কি ইতিহাস ছিল না? আমাদের পুরাণই ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারতও ইতিহাস, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কচরিত, রামচরিত এই ত ইতিহাস। এই যুক্তির উত্তর আমাদের এক জন বিখ্যাত লেখক রহস্যের আকারে কিন্তু সত্যসত্যই দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হনুমানের লেজ দু-হাজার ফুট লম্বা যে গ্রন্থে লেখা তাহা পুরাণ, আর যদি ঐ লেজটা ঘর্ষণ কর্ত্তন করিয়া তিন ফুটে নামান যায় তবে তাহা ইতিহাস হইবে।" অর্থাৎ ইতিহাস সত্য প্রকৃত জগতের ছবি, ইহা প্রকৃতির সত্য অতিক্রম করিতে পারে না। এজন্য পুরাণকে ইতিহাস বলা যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া রচিত কাব্যকেও এই নাম দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস সময় ও ব্যক্তিগণের ঠিক পরে পরে সাজান একটি অস্থিকঙ্কাল অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে, শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস বা কথার রঙীন কুয়াশা দিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না।

হিন্দুযুগে এরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই, যদি হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ইয়াং চুয়াং (৬৩০ খ্রীঃ) বলেন যে ভারতবর্ষের "মধ্যদেশে" প্রত্যেক প্রদেশের ঘটনার কাহিনী সদ্য সদ্য লিখিবার পদ্ধতি ছিল, এবং এই বিবরণগুলিকে "নীলপীট" নাম দেওয়া হইত। কিন্তু এরূপ রচনার এক পৃষ্ঠাও রক্ষা পায় নাই, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই।

সুতরাং মুসলমান-বিজেতাগণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের সভাসদ কর্ত্তৃক রচিত কাহিনীই প্রথমে ভারতে ইতিহাস-পদবাচ্য হইল, সাহিত্যে

একটা নূতন ধারা আনিয়া দিল। পরে হিন্দুরা পারসিক ও অন্যান্য ভাষায় ইতিহাস লিখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহা মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অনেক অংশে নিরেশ হইল। মুসলমান-লেখকদের কয়েকটি মহা সুবিধা ছিল, যেমন—(প্রথম) এক সন ও তারিখ—হিন্দুদের অসংখ্য সন ও মাস-গণন পদ্ধতির মত নহে। (দ্বিতীয়) এক সাহিত্যিক ভাষা পারসিক। (তৃতীয়) একই সাহিত্যিক আদর্শ। (চতুর্থ) জাতিভেদ না থাকায় অনেক স্থলে মুসলমান অসিধারীরা কলম চালাইতেও দক্ষ ছিলেন—সাহিব-ই-সয়েফ্ ব কলম্, ইহার ফলে তাঁহাদের দৃষ্ট ঘটনার বর্ণনা অতিশয় সত্য ও উজ্জ্বল আকারে লিখিত হইত। এই সুবিধাগুলি হিন্দুদের ছিল না। তদ্ভিন্ন নানা দেশের নানা জাতি ইসলামের প্রভাবে ভারতে মিলিত হইয়া, অতি শীঘ্র প্রাদেশিক বা জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া এক মিশ্রিত সাধারণ সমাজ গঠন করিয়া ফেলিত, এইরূপ লোকদের মধ্যে সাহিত্যের ছাঁচটা একই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিত, এবং ইতিহাসগুলিও এলোমেলো হইতে পারিত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হিন্দু ও মুসলমানের ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে হিন্দুরা ইহজগৎ অপেক্ষা পরলোকের কথাই বেশী ভাবে, তাহারা এই সব নশ্বর রাজরাষ্ট্র সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব জিনিষ মনোযোগ করিয়া দেখিয়া লিখিয়া তাহা হইতে স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক, অপারক, এক্ষেত্রে তাহারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক নীচে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—সুবিখ্যাত নজীব্-উদ্দৌলার পারসিক জীবনী সৈয়দ নুরুদ্দীন হোসেন লেখেন, আর তাঁহারই সমসাময়িক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জাঠরাজা সুরজমলের জীবনী 'সুজনচরিত্র' নামে হিন্দী ভাষায় মিশ্রণ নামক এক হিন্দু রচনা করেন। দুই জনই শিক্ষিত পদস্থ লেখক, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ দুখানির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এমন কি হিন্দু মুন্শী বিহারীলাল কর্তৃক পারসিক ভাষায় রচিত নজীব্-উদ্দৌলার জীবনী, নুরুদ্দীনের গ্রন্থের তুলনায় চাঁদের পাশে জোনাকির মত নিষ্প্রভ দেখা যায়।

ভারত-বিজয়ী মুসলমান রাজারা ভারতের বাহিরের মুসলমান জগৎ হইতে ইতিহাস-রচনার আদর্শ সঙ্গে করিয়া আনেন, আর যুগে যুগে ইসলামীয় সভ্যতার কেন্দ্র খোরাসান, বাঘদাদ, মিসর ও কর্ডোভা হইতে মুসলিম পণ্ডিতগণ ভারতে আসিয়া এই সাহিত্যকে নূতন রসে সতেজ করিয়া তুলিতেন। আমাদের এই সব রাজাদের নিজ নিজ ইতিহাস—অন্ততঃ পূর্ব্বজগণের কাহিনী, রচনা করাইবার একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল; অথবা তাঁহাদের সভায় প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ নিজ নাম অমর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট পারসিক ভাষায় সেই সেই যুগের ইতিহাস লিখিতেন। এইরূপে মহমূদ গজনবী হইতে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্য্যন্ত আট শত বৎসর ধরিয়া ভারতের কোন-না-কোন অংশ লইয়া পারসিক ইতিহাস রচিত হওয়ায় এক মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহার অতি অল্প অংশই লোপ পাইয়াছে।

আরও সৌভাগ্যের বিষয়, এই মহাসমুদ্রে আমরা এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত

কর্ণধার পাইয়াছি। তিনি লর্ড ডালহৌসীর করেন্ সেক্রেটারি সার্ হেনরি মায়ার্স এলিয়ট। তাঁহার আরব্ধ ও অধ্যাপক ডাউসন কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ-কৃত আট ভলুম *History of India as told by its own Historians* এই সব মুসলমান ঐতিহাসিকগণের জীবনী, গ্রন্থ-পরিচয়, সমালোচনা এবং অনেক স্থলে আংশিক অনুবাদ দিয়া এই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও মূল্য বুঝিবার, এই ক্ষেত্রের নিজ নিজ নির্ব্বাচিত কোণ-টুকুতে গবেষণা করিবার পথ অতি সুগম করিয়া দিয়াছেন। এলিয়টের আরও মহান্ কীর্ত্তি এই সব পারসিক ইতিহাসের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ। ডালহৌসী অতি জবরদস্ত বড়লাট ছিলেন, আজ এই রাজার রাজ্য জপ্ত করেন, কাল উঁহাকে কিছু জমি দেন, অথবা তৃতীয় এক রাজার সর্ব্বস্ব নীলামে চড়ান (যেমন নাগপুরকর ভোঁসলাদের)। সমস্ত ভারতের রাজন্যবর্গ তাঁহার প্রতাপে কম্পমান। এহেন লাটের ফরেন্ সেক্রেটারি ছিলেন— রাজার উপর রাজা, নবাব মহারাজ-শ্রেণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এই সাহেবের সখ ছিল পুরাতন পুথি সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাস বা ঐতিহাসিক জীবনী লইয়া লেখা ফারসী গ্রন্থ পাইলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন, ঐ বিষয়েই অনুসন্ধান আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং অতি দুষ্প্রাপ্য, অথবা সে পর্য্যন্ত জগতে অজ্ঞাত কোন ফারসী ঐতিহাসিক পুথি তাঁহাকে উপহার দিলে তাঁহার দরবারে অতি সহজে প্রবেশ করা যাইত, এমন কি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ছোটখাট রাজ্যও রক্ষা করা যাইত, অথবা কোন নবাবের পেন্‌সন বাড়ান যাইত। এইরূপে দিল্লীর বাদশাহী প্রাসাদে রক্ষিত অথবা প্রাচীন ওমরাদের জন্য সুন্দর অক্ষরে লিখিত মহামূল্যবান্ ফারসী পুথি তাঁহাদের বর্ত্তমান হতভাগ্য বংশধরেরা এলিয়টের নিকট ভেট দিতেন। ইহার মধ্যে এমন এমন গ্রন্থও আছে জগতে যাহার আর কোন নকল নাই। ভারতের মুসলমান-যুগের সমস্ত ফারসী ইতিহাস সংগ্রহ এবং অনুবাদ করা এলিয়টের জীবনের ব্রত ছিল, এ কাজ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, কারণ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বিলাত যাইবার পথে মারা গেলেন (১৮৫৩)। তখন এক ভলুম মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরব্ধ এই ঐতিহাসিক মহাকোষ তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পরে ভারত-সচিবের খরচে অধ্যাপক ডাউসন্ শেষ করেন (১৮৭৭ খ্রীঃ, আট ভলুমে, এবং পরিশিষ্ট লইয়া নয় ভলুমে)।

আমাদের আরও একটি সৌভাগ্যের বিষয়, এলিয়ট্ এই সব ঐতিহাসিক পুথি কুড়াইয়া একত্র করিয়া বিলাতে পাঠান সিপাহী-বিদ্রোহের পাঁচ ছয় বৎসর আগে। তাহাতেই এগুলি রক্ষা পাইয়াছে, আমরা এখন এগুলি দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ, যদি এগুলি দেশী মালিকদের বাড়ীতে থাকিত, তবে ঐ উত্তর-ভারতব্যাপী মহাবিপ্লবে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইত। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশময় (অর্থাৎ এলাহাবাদ-আগ্রায়) অশান্তি ও দাঙ্গা চলিতে থাকে, অর্দ্ধেক জেলার সরকারী কাগজ-পত্র পুড়াইয়া ফেলা হয়, দিল্লী লক্ষ্ণৌর উপরে তোপ চালান এবং জয় করিবার পর লুঠ করা হয়, অনেক নবাবের ও রাজার রাজবাড়ী নষ্ট এবং তাহাদের রাজ্য জপ্ত হইয়া

যায়। এই সব স্থানের পুথি লোপ পাইয়াছে। ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই মত একটি অরাজকতার ফলে এলফিনষ্টোন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অসংখ্য দুর্লভ ফারসী ঐতিহাসিক পুথি, মারাঠা সৈন্যদের দ্বারা তাঁহার পুণা রেসিডেন্সী-ভবন আক্রমণের সময় ধ্বংস হয় (১৮১৭ খ্রীঃ)। সুতরাং যে এলিয়ট-সংগ্রহ এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক পৃথক্ কক্ষে রক্ষা পাইতেছে তাহা জগতে অমূল্য, কারণ অনেক স্থলে অদ্বিতীয়।

ফারসী ভারত-ইতিহাস-মালার অনুবাদ সুদীর্ঘ আট ভলুমে প্রকাশ করিয়া এলিয়ট্-ডাউসন্ কত বড় উপকার করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় যদি আমরা ১৮৭৭ সালের আগে ও পরে লিখিত মুসলমান-ভারতের ইতিহাস দুখানি লইয়া তুলনা করিয়া দেখি। ঐ আট ভলুমের একটি সুফল ষ্টান্লি লেন্-পুল্-রচিত "মধ্যযুগীয় ভারত"। ইহাতে চারি শত পৃষ্ঠায় মুসলমান ভারত-ইতিহাস-রূপ মহানাটকের অঙ্কের পর অঙ্ক দৃশ্যপটের মত পাঠকের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছে, ইহার সমস্ত উপাদান এলিয়ট্ হইতে লওয়া। সব বর্ণনা নিখুঁত সত্য, সাক্ষীদ্বারা প্রমাণিত, অথচ বইখানি জীবন্ত মানুষে ভরা, আমরা সব বড় বড় ঐতিহাসিক পুরুষদের চরিত্র অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি, পাঠক যাহা পড়িবেন তাহা মনে বহুদিন স্মরণ থাকিবে। ফলতঃ মেকলে যেমন ইতিহাসকে সরস ও জীবন্ত করিয়া দিতেন, লেন্-পুল্ও তাহাই করিয়াছেন, এবং এলিয়টের গ্রন্থে অসংখ্য সমসাময়িক বিস্তৃত বিবরণ ও উক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পর অনেকেই অংশতঃ বা ব্যাপকভাবে গবেষণা করিবার সুবিধা এই আট ভলুম হইতেই পাইয়াছেন।

কিন্তু এলিয়ট্ আমাদের প্রথম পথ-প্রদর্শক এবং নমুনা-দেখাইবার ব্যবসায়ী ছিলেন। এখন আর নমুনায় চলে না, আমরা প্রতি মূলগ্রন্থের অবিকল সম্পূর্ণ অনুবাদ চাই, এবং তাঁহার পর অনেক নূতন গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৫৫৬ সালে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, এবং ভারতে স্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহার এবং মুঘলদের পূর্ব্বেকার যুগের ভারতের ফারসী ইতিহাসগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ—শুধু সংখ্যাতে নহে, গুণেও। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মুঘল-যুগের প্রধান কীর্ত্তি সরকারী ইতিহাস, অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারিখ ও স্থানের লোকের নাম দিয়া, মাস ও বৎসর অনুসারে সাজাইয়া প্রত্যেক সম্রাটের রাজ্যকালের সুদীর্ঘ ইতিহাস লেখা হইয়াছে, এবং সেগুলির সেই সেই বাদশাহের নাম-অনুসারে নাম দেওয়া হইয়াছে, যেমন "আকবর-নামা" অর্থাৎ আকবরের গ্রন্থ (ফারসীতে নামাঃ শব্দের অর্থ গ্রন্থ, ইহা 'নাম' শব্দ হইতে ভিন্ন), পাদিশাহ-নামা (অর্থাৎ শাহজাহানের), আলমগীর-নামা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, এগুলির উপাদান ইতিহাসের আদি ও অবিকৃত সমসাময়িক মশলা, অর্থাৎ নানা স্থান হইতে কর্ম্মচারিগণ বাদশাহ ও মন্ত্রীদের যে-সব পত্র, ডায়েরী, যুদ্ধের এবং শত্রুর দূতের সহিত আলোচনার রিপোর্ট, সন্ধির খসড়া, হিসাবের কাগজ প্রভৃতি লিখিয়া পাঠাইতেন তাহা বাদশাহী রেকর্ড অফিসে ("বস্তা-খানায়") জমা থাকিত, তাহা দেখিয়া এই শ্রেণীর বইগুলি রচিত।

মুঘল বাদশাহদের আগে এই শ্রেণীর ইতিহাস একখানিও ভারতে রচিত হয় নাই। তাহার

প্রথম কারণ সে সময় সভ্যতা তত অগ্রসর হয় নাই, আর দেশে শান্তিও কম ছিল। কোন রাজবংশই তখন দিল্লীতে তিন পুরুষের বেশী সিংহাসন রাখিতে পারেন নাই। আর এই সব রাজারা প্রায় যাযাবর ছিলেন ; সৈন্যসামন্ত লইয়া আজ এখানে, কাল ওখানে তাবু খাটাইয়া মাস ও বৎসর কাটাইতেন ; এক নির্দ্দিষ্ট রাজধানীতে স্থির হইয়া বসিয়া সভা করিতে পারিতেন অতি কম দিনই। যাঁহাদের অর্দ্ধেক জীবনের অধিক কাল বিদ্রোহদমনে বা রাজ্য-বিস্তারে কাটাইতে হইত, তাঁহারা সাহিত্য ইতিহাস সৃষ্টি করাইবার অবসর পাইতেন না। পুথি দলিল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার পক্ষেও নানা বাধা ছিল। যদি বা কিছু সংগৃহীত হইত তাহাও অশান্তি এবং ঘন ঘন স্থান-পরিবর্ত্তনে শীঘ্রই নষ্ট হইত, অথবা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িত।

কিন্তু ঠিক মুঘল-যুগের "নামা"-গুলির মত বড় না হইলেও, কয়েক খানি মূল্যবান্ ইতিহাস আমরা তাহার পূর্ব্বের যুগে পাই। এগুলি একটানা ইতিহাস, অনেক সময়ে বাবা আদম্ হইতে আরম্ভ ! কেবল মাত্র রাজার সমস্ত রাজত্বকাল বা কয়েক বৎসর লইয়া লিখিত নহে।

আরবী ভাষায় লিখিত ঘজনীর সুলতান মামুদের ইতিহাস "কিতাব্-ই-ইয়ামিনি" বড় কম সংবাদ প্রদান করে, ইহার ইংরাজী অনুবাদ (ফারসী অনুবাদের অনুবাদ) বিশুদ্ধ নহে। ঐ রাজবংশের বৈহাকী নামক এক জন কর্ম্মচারী একখানি সুদীর্ঘ ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের মামুদ-পুত্র মাসুদের কাহিনী—এই অংশটুকু মাত্র রক্ষা পাইয়াছে, যে খণ্ডে মামুদের কার্য্যকলাপ বর্ণিত ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে, কোথাও মিলে না। সুতরাং ঐ রাজার ভারতে কীর্ত্তির জন্য এখন শিলালিপি প্রধান সম্বল।

তাহার পর ঘোরী-বংশ। ইঁহাদের জন্য "তাজ-উল্-মাসির" নামক গ্রন্থ আছে, কিন্তু ইহা নামতঃ ইতিহাস হইলেও কবিতা ও অলঙ্কারের ভারে ইতিহাস প্রায় দমবন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। "তবকাৎ-ই-নাসিরী" (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে) আমাদের ভারতীয় মুসলমানযুগীন প্রথম ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাভার্টি সাহেব এখানির সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন (যদিও তাঁহার অনেক টীকা অতিপাণ্ডিত্য-দোষে দূষিত এবং ভুল)। খিলজী-বংশের জন্য আছে জিয়া বার্ণী-রচিত "তারিখ-ই ফিরোজশাহী", অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (যদিও গ্রন্থকারের পক্ষপাতদোষ পরলোকগত অধ্যাপক গার্ডনার ব্রাউন প্রথমে দেখাইয়া দেন), এখানিতে প্রথম দুই তুঘলুক সুলতান, এবং ফিরোজ শার ১-৬ বৎসরের বিবরণও আছে। শেষোক্ত সুলতানের সম্পূর্ণ ইতিহাস শমস্-ই-আফিফ্-রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" (এলিয়ট এই দুই গ্রন্থের দীর্ঘ অনুবাদ দিয়াছেন এবং প্রথমখানির অপর এক অনুবাদ *J. A. S. B.*তে অতি পূর্ব্বে ১৮৬৩-৬৪তে ছাপা হয়।) আফঘান অর্থাৎ লোদী এবং সুর-বংশের ইতিহাস তেমন ভাল নাই। এই সব ইতিহাস ভিন্ন আমির খসরুর কাব্য ও গদ্য রচনাগুলি, মহরুর চিঠিপত্র, ইবন্-বতুতার ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ যুগের অনেক খবর দেয় এবং কোন ঐতিহাসিক এগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তৃতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৪৫

মুঘল ভারতের ইতিহাস

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

উপাদানের শ্রেণী-বিভাগ

মুঘল সাম্রাজ্যের শিল্প-কলা ও ধন-দৌলতের কথা আমরা সকলেই জানি; সে যুগের অট্টালিকা ও চিত্র আজিও জগতের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৌরবের, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কাজের দান হইতেছে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অজস্র ও বিচিত্র ধারা। এগুলির অনুগ্রহে মধ্যযুগের ভারতের অবস্থা, সমাজ ও সভ্যতা আমরা এখনও যেমন অতি সূক্ষ্ম, অতি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই, অন্য যুগের পক্ষে তেমন সম্ভব নহে। এই সব ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সেগুলি একই ঘটনা বা রাজত্বকালের উপর নানা দিক্ হইতে আলোকপাত করে, একটি অপরটিকে সমালোচনা ও সংশোধন করিবার উপকরণ-স্বরূপ।

প্রথম শ্রেণী—আকবর হইতে বাহাদুর শাহ্ (অর্থাৎ প্রথম শাহ্ আলম) পর্য্যন্ত, ১৫৫৬ হইতে ১৭১০ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র দীর্ঘ ধারাবাহিক সরকারী ইতিহাস লিখিত হয়, যেমন 'আকবরনামা', 'পাদিশাহ্‌নামা', 'আলমগীরনামা' এবং 'বাহাদুরশাহ্‌নামা'। এই সঙ্গে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীকেও ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বে-সরকারী ইতিহাস; এগুলি সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইলেও, অফিশিয়াল্ হিষ্ট্রি অর্থাৎ সরকারী আজ্ঞায় দরবারে লিখিত এবং বাদশাহ্ বা উজীরের দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস হইতে ভিন্ন। এগুলির রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র এবং ঘটনা ও তারিখ অনেক কম। বড় কর্ম্মচারীদের জীবনচরিতও এই শ্রেণীতে আসে।

তৃতীয় শ্রেণী—এগুলিকে রীতিমত ইতিহাস বলা চলে না, খণ্ড ইতিহাস অথবা ইতিহাসের উপকরণ বলিলে অধিক সত্য হয়, যেমন দিন-লিপি (ডায়েরী), কোন সমর-অভিযানের সম্পূর্ণ রিপোর্ট, ইত্যাদি।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—ইতিহাসের কাঁচা মসলা, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য অমূল্য আধার, যেমন সমসাময়িক চিঠি এবং হাতে-লেখা খবরের কাগজ।

ষষ্ঠ শ্রেণী—শাসন সম্বন্ধে কাগজপত্র, চিঠি, আজ্ঞা, আয়ব্যয়ের বিবরণ, হিসাব ইত্যাদি।

এখন এই বিভিন্ন ধরণের ইতিহাসগুলির স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। আকবরের আজ্ঞায় শেখ আবুল্-ফজ্‌ল্ 'আকবরনামা' লিখিয়া যে একটি সাহিত্যিক নমুনা শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে দিয়া যান, তাহাই দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী বাদশাহ্‌দের চরিতকারেরা অনুকরণ করেন। এই সরকারী ইতিহাসের এমন কয়েকটি চিহ্ন আছে, যাহা অন্য ধরণের ইতিহাসে নাই। (ক) এগুলি ঠিক বর্ষ ও তারিখ অনুসারে ঘটনা সাজাইয়া লিখিত, (খ) তারিখ, লোকের নাম ও স্থানের নাম এত বেশী দেওয়া হইয়াছে যে, অনেক স্থলে ঠিক আজকালকার পূজার ছুটির পূর্ব্বে কর্ম্মচারী-বদলের গেজেটের মত অপাঠ্য। (গ) কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করায় আমরা অনেক বিষয়ে সংবাদ পাই, তাহা ইতিহাস ভিন্ন অন্য কাজেও লাগে, যেমন জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি। (ঘ) এই শ্রেণীর বইগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্য এই কারণে যে, ইহাদের ঘটনাবর্ণন ও তারিখগুলি একেবারে সত্য, এবং মূল আধার হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা, অর্থাৎ মৌলিক ও সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই আমার বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পারসিক ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান। এটা সহজে বুঝাইবার জন্য এই সরকারী ইতিহাসগুলি কিরূপে রচিত হইত, তাহার বিবরণ দিতেছি—

বাদশাহ্ কোন এক জন পারসিক ভাষায় সুলেখক বিখ্যাত পণ্ডিতকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাকে সরকারী ঐতিহাসিক বা Historiographer Royal নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা দিতেন যে, আমার রাজ্যকালের একখানা চিরস্থায়ী ইতিহাস লেখ। সমস্ত সরকারী বিভাগের —বিশেষতঃ দপ্তরখানার কাগজপত্র তাঁহাকে দেখাইবার ও নকল করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। প্রদেশে প্রদেশে আজ্ঞা যাইত যে, সেখানকার পুরাতন ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা, প্রধান ঘটনা ইত্যাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে এই লেখকের নিকট পাঠাইতে হইবে। ঠিক যেমন স্যর্ উইলিয়ম হাণ্টার কর্ত্তৃক *Imperial Gazetteer of India* রচনার সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করেন। এই নির্ব্বাচিত লেখক মহাশয়ের প্রধান সম্বল হইল সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা(সুবাদার)-দের প্রেরিত রিপোর্ট এবং তাঁহাদের শিবির ও করদ রাজাদের দরবার হইতে প্রেরিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই শেষোক্ত কাগজগুলি প্রথমে 'ফর্দ্দ-এ-ওয়াকেয়া' এবং পরে 'পারচা-এ-আখ্‌বার' অথবা আখ্‌বারাৎ নামে পরিচিত। এগুলি বাদশাহী দপ্তরে (বস্তাখানা বা রেকর্ড অফিসে) যত্নে রক্ষিত হইত। এই মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া লেখক মহাশয় মনোরম অথবা কাজের সংবাদগুলি তারিখসহ নকল করিয়া লইতেন। পরে তাহা হইতে ঘটনার কাঠামো বা অস্থিকঙ্কাল রচনা করিয়া অধ্যায়গুলি সাজাইয়া বই লিখিতে বসিতেন।

বাদশাহ, নিজ কর্ম্মচারীদের যে পত্র (ফর্ম্মান্) পাঠাইতেন, বাদশাহের আজ্ঞায় উজীর অন্য লোককে যে সব হুকুম পাঠাইতেন (হস্‌ব্-উল্-হুকম্, অর্থাৎ ঠিক আমাদের গেজেটে By order ইস্তিহারের মত, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের নামে প্রেরিত)—এগুলির নকল ঐ কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে থাকিত; রাজ-ঐতিহাসিক এগুলির মধ্যে কোন কোন দলিল হুবহু নিজ গ্রন্থে বসাইয়া দিতেন। এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছে; কারণ, আমরা ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীর উপকরণ অর্থাৎ সরকারী দলিল বা document এইরূপে অবিকৃত আকারে পাইয়াছি, আসল দলিলখানা হয়ত অনেক দিন হইল লোপ পাইয়াছে, এই নকল মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, টেক্স, বিচার প্রভৃতি বিভাগ সম্বন্ধে অতি অমূল্য ফর্ম্মান্ এইরূপে বাদশাহী সরকারী ইতিহাসের—বিশেষতঃ গুজরাতের শেষ মুঘল দেওয়ান-রচিত 'মিরাৎ-ই-আহমদী' নামক গ্রন্থের, মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

আবুল্-ফজ্‌ল্ এবং বাদাউনীর তুলনা

এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রবর্ত্তক শেখ আবুল-ফজ্‌ল্, তাঁহাকে এক জন পাদ্রী "আকবরের দ্বিতীয় আত্মা" নাম দিয়াছেন। আমরা আবুল-ফজলের ধর্ম্মমত, রাজসরকারে প্রতিপত্তি প্রভৃতির আলোচনা না করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অকীর্ত্তি আজ বিচার করিব। তাঁহার গ্রন্থগুলির মূল্য সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু অনেক সাহেব তাঁহাকে মিথ্যাবাদী চাটুকার বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা যাউক, আবুল-ফজল যে আকবরকে ভক্তি করিতেন, তাহা কি তাঁহার ভণ্ডামি, অথবা অযোগ্য রাজার প্রতি সম্মান দেখান? তাঁহার গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে তিনি যে আকবরকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, দেবতুল্য সর্ব্বগুণে ভূষিত লোকপিতা বলিয়া ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। আর যাঁহারা ভারত-ইতিহাস জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, আকবর দেবতুল্য রাজা ছিলেন, তিনি ভারতে এমন দুইটি জিনিষ দান করিয়াছিলেন, যাহা আর কোন মুসলমান রাজার সময়ে পাওয়া যাইত না এবং যাহা বর্ত্তমান সভ্য শাসন-প্রণালীর চিহ্ন। সে দুইটি হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মের নিরপেক্ষ প্রতিপালন (সুল্‌হ্-ই-কুল্) এবং সরকারী কাজে জাতিনির্ব্বিশেষে গুণীর নিয়োগ,—অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে গেলে universal toleration এবং career open to talent. তাহার উপর পাঠান-যুগের শত শত বর্ষব্যাপী মারামারি, বিদ্রোহ, খুন ও অরাজকতার পর আকবর উত্তর-ভারতময় যে শান্তি স্থাপন করিলেন, তাহা অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী হাজার বৎসরে দেখা যায় নাই। এই শান্তি ও সুশাসনের ফলে দেশময় ধন ও সুখ বাড়িতে লাগিল, সাহিত্য ও কলা, কি হিন্দুদের মধ্যে, কি মুসলমানদের সমাজে, দিন দিন বিকশিত হইতে থাকিল। যে রাজার এরূপ মহান্ কীর্ত্তি, তাঁহাকে 'নরদেব' বলিলে কি প্রাচ্য-দেশীয়

রাজস্তুতি হয়, না ইংরাজ জ্ঞানী কার্লাইলের প্রশংসিত হিরো-ওয়ার্শিপ হয়? আকবর কার্লাইলের বর্ণিত হিরোদের গুণে ভূষিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি করা স্বাভাবিক এবং উচিত। ইসলাম ধর্ম্ম অনুসারে পাদিশাহ একাধারে পোপ এবং সম্রাটের পদস্থ, তিনি জীবন্ত খলিফা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের উত্তরাধিকারী, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পূজার যোগ্য। তাঁহার উপাধি কিব্‌লা ও কাবা, ঈশ্বরের ছায়া, পীর ও মুর্শিদ। তবে স্বীকার করি যে, অলঙ্কারের ছটায় এবং অত্যুক্তির ফলে স্থানে স্থানে আবুল-ফজলের লেখা পাঠকের বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং তিনি যে সব ভাল কাজই নিজ প্রভুর উপর আরোপ করিয়াছেন, তাহা কখন কখন অসত্য।

আবুল-ফজলের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ তাঁহার ভাষার ভঙ্গিমা। এক জন সাহেব রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মানবকে ভগবান্ ভাষা দিয়াছেন মনের ভাব গোপন করিবার জন্য। আবুল্-ফজল্ এমন রচনা-পদ্ধতি ও শব্দবিন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার লেখার অর্থ বুঝা বিশেষ কষ্টকর। একটি মাত্র উপমা লইয়া তাহার শত বিভিন্ন আংশিক আকার ধরিয়া লম্বা লম্বা পৃষ্ঠা ভরিয়া একটি মাত্র বাক্য (sentence)। এই মুদ্রাদোষটি তিনি আমির খস্রুর রচনা হইতে পান; কিন্তু আমির খস্রু কবি ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এটা তত দোষাবহ ছিল না। কিন্তু যখন এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক লেখার ভঙ্গিমা শিহাবুদ্দীন তালিশ মিরজুমলার কুচবিহার ও আসাম জয় নামক গ্রন্থে অনুকরণ করিলেন, তখন সেটা পাঠকের অসহ্য কষ্টকর হইল। যাহা হউক, আবুল-ফজলের গ্রন্থে আমরা অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য পাই, ইহার ঘটনাগুলি অতি সত্য ও বিচিত্র।

এই সংশ্রবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী লেখক আবদুল কাদির বাদাউনীর আলোচনা করা আবশ্যক। সাহেবেরা এই ঐতিহাসিকের গ্রন্থকে অযথা মাথায় তুলিযাছেন, বোধ হয় আবুল-ফজলের প্রতি বিরাগের ফলে। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে, বাদাউনীর গ্রন্থে ঘটনা অনেক কম এবং তিনি সরকারী দপ্তরখানার সাহায্য না পাওয়াতে অনেক ঘটনার গুজব ও মিথ্যা বর্ণনা লিখিয়াছেন। তিনি রাজদরবারে বড় কম সময় ছিলেন, সুতরাং বড় বড় কর্ম্মচারীর মুখে তাহাদের দৃষ্ট ঘটনার কাহিনী শুনিবার সুবিধাও পান নাই। তাহার পর তাঁহার চরিত্র আলোচনা করা যাউক। তাঁহার গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে আবুল-ফজলের এবং আবুল-ফজলের পিতা (বাদাউনীর শিক্ষক !!!) শেখ মুবারকের প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। উহারা এত টাকা ও উচ্চ পদ পাইল, আমি পাইলাম না, হা খোদা, এই তোমার ন্যায়বিচার? এইরূপ কাঁদুনি পড়িয়া হাসিও আসে, কান্নাও পায়। আবুল-ফজল-পরিবার এবং আকবর সম্বন্ধে যেখানে যত নিন্দার গল্প-গুজব শুনিয়াছেন, বাদাউনী তাহা নির্ব্বিচারে নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। এইরূপ করিবার ফলে তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থলে আপনা হইতেই বিশ্বাসের অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়। বইখানির উপর ধর্ম্মের নামাবলী চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পদে পদে কুরাণ হইতে বচন তোলা, ইসলাম নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার,

আমিই সাত্বিক সুন্নী বলিয়া আস্ফালন, এই ভঙ্গিমাগুলি পড়িয়া বাদাউনীকে ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড বলিতে হয়। আর তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মকনপুর গ্রামে শাহ্ মদার নামক পীরের পবিত্র সমাধি-মন্দিরে একটি স্ত্রীলোক-যাত্রীর ধর্ম্মনাশ করিবার চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে প্রেয়সীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেয়! অথচ তখন তিনি সেই জেলার দেওয়ানী জজের পদে প্রতিষ্ঠিত। (মূল, ২ ভা, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বাদাউনীর কথাগুলি চোখ বুজিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইতিহাসের তত্ত্ব যে "নিহিতং গুহায়াং" এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটে।

এই সরকারী ইতিহাসগুলি প্রায় আড়াই-শ বৎসরের ধারাবাহিক কাহিনী দেয়, কেহ কম, কেহ বেশী বিস্তৃত ভাবে। ইহার মধ্যে বাবর এবং জাহাঙ্গীর-লিখিত আত্মকাহিনী এবং হুমায়ুনের চাকর জৌহর-রচিত সেই বাদশাহের রাজত্ব-কাহিনীও ধরিতে হইবে। সুদীর্ঘ এবং রীতিমত সরকারী ইতিহাস আকবর হইতে আরম্ভ—

(১) 'আকবরনামা', ৩ খণ্ডে, আবুল-ফজল রচিত এবং তাঁহার খুনের পর সরহিন্দী কর্ত্তৃক শেষ চারি বৎসরের বৃত্তান্ত লিখিয়া সম্পূর্ণ করা হয়। (২) জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী ও তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরের জন্য হাদি কর্ত্তৃক রচিত পরিশিষ্ট। (৩) শাহজাহানের ৩১ বৎসব রাজত্ব লিখিয়া গিয়াছেন, আবদুল হামিদ লাহোরী ১-২০ বৎসর, ওয়ারিস্ ২১-৩০ বৎসর এবং সালিহ্ কাম্বু ৩১ বৎসর ও কয়েক মাস। আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসরের অতি বিস্তৃত ইতিহাস তাঁহার আজ্ঞায় কাজিম্ কর্ত্তৃক লিখিত, ১১০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, এবং সমস্ত ৫১ বৎসরব্যাপী রাজত্বের সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সরকারী কাগজ দেখিয়া লেখা 'মাসির-ই-আলমগীরী,' ৫৪১ পৃষ্ঠা (সাকী মুস্তাদ খাঁ-রচিত)। তাহার পর প্রথম-বাহাদুর শাহ্র অতি দীর্ঘ "নামা" দুই বৎসরের মাত্র (ন্যামৎ খাঁ আলীর রচনা)—ফররুখসিয়রের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—মুহম্মদ শাহের (রাজত্ব ১৭১৯-১৭৪৮) ঐতিহাসিক তাঁহার "দুধ-ভাই" অর্থাৎ ধাতৃপুত্র মুহম্মদ বখ্শ্ (ছদ্মনাম আশোব্), কিন্তু অনেক পরে, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, এক জন সাহেবের জন্য রচিত। এই বাদশাহের ঠিক পরবর্ত্তী দুই উত্তরাধিকারী আহমদ এবং দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৪৮-১৭৫৯) সম্বন্ধে মাস, তারিখ দেওয়া ধারাবাহিক দুখানি "নামা" স্যর হেনরি এলিয়ট সংগ্রহ করেন, তাহা এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে, আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার পর, দ্বিতীয় শাহ্ আলম পুত্তলিকা মাত্র ছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার জন্য ঐরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই; তবে মুন্নালাল প্রভৃতি কেরাণীরা দুই তিনটি সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া গিয়াছে, সেগুলি "নামা" নহে।

অপর সব শ্রেণীর ইতিহাস

দ্বিতীয় বিভাগের ইতিহাস। এই শ্রেণীতে তিন জন অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক আছেন, বথ্শী নিজামুদ্দীন আহমদ, ফিরিশ্তা এবং খাফি খাঁ। ইহাদের যেমন বিষয়-বিন্যাসে দক্ষতা, সরল অথচ মনোরম ভাষা, অত্যুক্তি এবং বাজে কথা পরিত্যাগ, তেমনি নানা গ্রন্থ খুঁজিয়া এবং নানা কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা। আর এই তিনখানি গ্রন্থেই ভারতের মুসলমান-যুগের সমগ্র ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহ্দের কাহিনীর সহিত প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যগুলির ইতিহাস (সংক্ষেপে) লিখিত আছে। নিজামুদ্দীন এই দৃষ্টান্তটি দিয়া যান; পরবর্ত্তী পারসিক লেখকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, এবং নেহাবন্দী, বাদাউনী ও ফিরিশ্তা স্বীকার করিয়া তাঁহার কাহিনী হুবহু চুরি করিয়াছেন। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি অমূল্য। তেমনি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে ফিরিশ্তার ইতিহাস অমূল্য, কারণ, তিনি তথাকার লোক এবং নিজামুদ্দীনের বিশ বৎসর পরে লেখেন, তিনি অনেক দক্ষিণী ঐতিহাসিক উপকরণ পান, যাহা নিজামুদ্দীনের হাতে আসে নাই। ফিরিশ্তার ইতিহাস ১৬১৫ সালে শেষ হইয়াছে, খাফি খাঁর ১৭২৬ সালে (নামতঃ ১৭৩৪এ)। খাফি খাঁর দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে অংশটি (৩য় ভল্যুম) কোন কাজের নহে, তাঁহার গ্রন্থের ২য় ভল্যুম খুব মূল্যবান্, কারণ, ইহাতে আওরংজীব এবং তাঁহার বংশধরদের বিবরণ আছে, যাঁহারা খাফি খাঁর অনেকটা সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ ১৬৮০ হইতে ১৭২৬ পর্য্যন্ত প্রায় সব ঘটনাই এই লেখকের দৃষ্ট অথবা জ্ঞাত। তবে এখানে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, এই শেষ অংশেও খাফি খাঁর কথা চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না, কারণ, তিনি সরকারী দলিল বা আখ্বারাৎ (সংবাদ-পত্র) একখানিও পান নাই, এমন কি, আওরংজীবের সরকারী সম্পূর্ণ ইতিহাস ('মাসির', ১৭১১তে লিখিত) পর্য্যন্ত দেখেন নাই। খাফি খাঁকে প্রায় সর্ব্বত্রই সংশোধন করাই ঐ যুগের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই সংশোধনের জন্য অপর পারসিক ও মারাঠী ভাষার উপকরণও প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। ছোট ছোট অথবা সংকলন মাত্র গ্রন্থের নাম করিব না।

তৃতীয় বিভাগ—কর্ম্মচারীদের জীবনীর অংশ অথবা দিন-লিপি (ডায়েরী)। এগুলি অমূল্য প্রাথমিক মসলা, যদিও ইহাদের দৌড় বড় কম। এই শ্রেণীতে নেহাবন্দী-রচিত খাঁ-খানান্ আবদুর রহিম্-এর (সেনাপতি ও হিন্দী-ফারসী কবির) জীবনী, মির্জা নাথনের কীর্ত্তি-কাহিনী 'বহারিস্তান্-ই-ঘাইবী', কার্য্যতঃ বাঙ্গলা প্রদেশের জাহাঙ্গীরের রাজ্যকাল ব্যাপিয়া অতি বিস্তৃত মৌলিক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতিহাস, শিহাবুদ্দীন তালিশ-লিখিত মিরজুমলার কুচবিহার ও আসাম জয় এবং শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাটগাঁ অধিকার প্রভৃতি। যাঁহারা এগুলির অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্তসার পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মূল্য বুঝেন, এগুলি বর্ত্তমানের আবিষ্কার।

সমসাময়িক পারসিক চিঠি এবং সংবাদপত্র

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—চিঠি এবং হস্তলিখিত সংবাদ-পত্র (আখ্‌বারাৎ)। এগুলি তৃতীয় বিভাগের গ্রন্থগুলি অপেক্ষাও অধিকতর মৌলিক ও মূল্যবান্ উপকরণ, ফলতঃ আমি সর্ব্বদাই এগুলিকে ভারত-ইতিহাসের আদি মসলা (raw materials of Indian history) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি।

আকবরের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত পারসিক ভাষায় অসংখ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চিঠি—রাজপুতানায় অতি কম হিন্দী বা রাজস্থানী ভাষায় পত্র, এবং মহারাষ্ট্রে মারাঠী ভাষায় লিখিত হাজার হাজার চিঠি ও রিপোর্ট (অধিকাংশ ১৭১৫ সালের পরবর্ত্তী) রক্ষা পাইয়াছে, এবং বোধ হয় তাহার পাঁচ ছয় গুণ সামগ্রী কালের প্রকোপে ধ্বংস হইয়াছে। আজ শুধু মুঘল যুগের প্রথম দেড়-শ বৎসরের (অর্থাৎ আওরংজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত) রচিত পারসিক ভাষায় পত্রগুলির কথা বলিব। প্রত্যেক বাদশাহ্ এবং ছোট বড় কর্ম্মচারী ও রাজা-নবাব-জমিদারের পত্র লিখিবার জন্য মুন্‌শী অর্থাৎ সেক্রেটরী থাকিত। পত্রগুলি পারসিক ভাষায় রচিত হইত, এবং এই মুন্‌শীরা অধিকাংশই হিন্দু (কায়েৎ অথবা ক্ষেত্রী)। এমন কি, ডি বয়েঁ, পেরোঁ প্রভৃতি ফরাসী সেনাপতিও পারসিক মুন্‌শীর দ্বারা বাদশাহী দরবার ও দেশী রাজাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেন। এই মুন্‌শীগুলি সযত্নে পারসিক রচনা শিখিয়া, যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত এবং 'ফুল্ল-কুসুমিত' শব্দ প্রয়োগ করিতেন, আর সেই সব পত্র-রচনার নকল রাখিতেন, যেমন আজকাল সব অফিসে ও জমিদারীতে লেটার-বুক থাকে। এই পত্রগুলি মুন্‌শী মহাশয়দের সাহিত্যিক রচনা হিসাবে গর্ব্বের বস্তু হইত; তাঁহারা (অথবা তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুত্রগণ) ঐ পত্রগুলি একত্র গুছাইয়া সাজাইয়া, ভূমিকা যোগ করিয়া দিয়া শিক্ষিত জগতে প্রচারিত করিতেন, ইহা তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে বলিয়া। এইরূপে অনেক সরকারী ও অন্য ঐতিহাসিক পত্র রক্ষা পাইয়াছে—নকলের দ্বারা, কারণ, আসল সীল-পাঞ্জা-মার্কা পত্রগুলি আলাহিদা থাকায় সব লোপ পাইয়াছে। পারসিক ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক চিঠির ভাণ্ডার যে কত বিচিত্র ও বিপুল, তাহা আমার লিখিত *Studies in Aurangzib's Reign* নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে এবং *Cambridge History of India*, Vol. IV, Chapters 8 & 10এর গ্রন্থপঞ্জী পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

আর, রাজদরবার, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কাছারি এবং সেনাপতিদের শিবির হইতে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে হাতে-লেখা খবরের কাগজ প্রেরিত হইত; ইহার নাম ওয়াকেয়া, পরে আখ্‌বারাৎ। ১৬৫৮ সাল হইতে ইহার অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকারগুলি সব ধ্বংস হইয়াছে। এগুলি অমূল্য এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক উপাদান। ইহার সাহায্যে বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাসও সংশোধন করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমার রচিত 'আওরংজীব', 'শিবাজী', 'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ

এ-পর্য্যন্ত পারসিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ও মসলার কথা বলিলাম। এখন সপ্তম বিভাগ অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষায় রচিত তৎকালীন বিবরণ ও রিপোর্টের কথা বলিয়া শেষ করিব। এই শ্রেণীর উপাদানগুলিকে সাহেবেরা অযথা মূল্য দিয়া থাকেন। আমি স্বীকার করি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাদের সুখদুঃখ, রাস্তাঘাট, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজের সমালোচনায় এই বিদেশী সাক্ষী-গুলির কথা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মহা অভাব পূরণ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ধরিলে এই ভ্রমণ-কাহিনী ও রিপোর্ট অনেক সময় বিশ্বাসের অযোগ্য, গুজবের উপর নির্ম্মিত অথবা ভাসাভাসা মামুলী কথামাত্র। সে যুগে বিদেশী ভ্রমণকারী ও পাদ্রীগণ পারসিক ভাষায় লেখাপড়া করিতে জানিতেন না, কোন রকমে উর্দ্দুর সাহায্যে কথাবার্ত্তা চালাইতেন, সুতরাং তাঁহারা পারসিক ভাষায় লিখিত সরকারী কাগজ বা গ্রন্থ ও পত্রাদির জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য ফাদার্ মন্‌সেরাট্ এবং মানুচী পর্য্যন্ত হাস্যকর ভুল করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের পারসিক ভাষার জ্ঞান কর্ণের দ্বারা প্রাপ্ত, চক্ষুর দ্বারা নহে। আবার এই সব সাহেবদের মধ্যে অনেকে ভারতে অতি অল্পদিন মাত্র কাটাইয়াছিলেন, আর কেহ কেহ ছোট নগণ্য মফস্বল শহরে বাস করিতেন; কাজে কাজেই সত্য সংবাদের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ রাজসভা ও সেনাপতির শিবির হইতে দূরে থাকায় প্রকৃত তথ্য শুনিতে পান নাই।*

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা।

গোপাল ভট্ট

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট্

কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিলে, চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের যে-পরিচয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবসংপ্রদায়ের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি বিক্ষিপ্ত, সামান্য ও অনিশ্চিত। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট শেষ জীবন রূপ-সনাতন প্রভৃতির সাহচর্য্যে বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার পুস্তকগুলির রচনা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, কারণ, উক্ত গ্রন্থে (আদি, ১।৩৭) বৃন্দাবন-গোস্বামীদের উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে আপনার অন্যতম শিক্ষাগুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু আরও কয়েক বার (আদি, ৯।৪, ১০।১০৫; মধ্য, ১৮।৪৯) তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণদাস গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। উক্ত আছে, বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া গোপাল ভট্ট নিজের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে, অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দের অধিক কাল পরে, নরহরি চক্রবর্ত্তী এই প্রবাদের কথা বলিয়া[১], তাঁহার স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই ত্রুটি-সংশোধন উপলক্ষ্যে মুখ্যতঃ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপাতত গোপাল ভট্টের পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। নরহরির বিবরণ হইতে জানা যায়, চৈতন্যদেবের সহিত গোপাল ভট্টের প্রথম সাক্ষাৎ ও তদনুগ্রহলাভ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কট ভট্ট ছিলেন দক্ষিণদেশের এক জন শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা নরহরি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ, এই তিন ভ্রাতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ও শ্রীবৈষ্ণবসংপ্রদায়ভুক্ত, কিন্তু চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহারা রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত হইয়াছিলেন। এবং বেঙ্কটতনয় বালক গোপাল ভট্ট তাঁহার সেবক ও ভক্ত হইয়া, পরে রূপসনাতনের সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ সেই সময়ে লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব ভট্টগৃহে চারি মাস বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার নাকি

চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন।[২]

১। শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল।
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে।
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে অন্য না করে প্রচার।
('ভক্তিরত্নাকর', বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩২, পৃঃ ১৫)

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ করিয়া নরহরি স্বীকার করিয়াছেন যে—

গোপাল ভট্টের নাম অব্যক্ত সেথায় ।২

এবং স্বীয় উক্তির কৈফিয়ৎস্বরূপ পুনরায় বলিয়াছেন—

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কটতনয় ।২

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং "অন্যত্র" এই প্রসঙ্গে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কবিকর্ণপুর তাঁহার সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে[৩] লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গপুরীতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সূত্রে বেঙ্কট ভট্টের বা তৎপুত্র গোপাল ভট্টের কোনও উল্লেখ নাই। কবি-কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও এ ঘটনার কোন কথা পাওয়া যায় না। যে সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত'[৪] মুরারি গুপ্তের নামে প্রচলিত আছে, তাহাতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস আতিথ্য গ্রহণের কথা আছে; কিন্তু এখানে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র নহে, ত্রিমল্লের স্বল্পবয়স্ক বালক পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে (মধ্য, ১।১০৮-১০ ও ৯।৮২-১৬৩) প্রকাশ পায় যে, চৈতন্যদেব ত্রিমল্ল ও বেঙ্কট ভট্টের গৃহে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ও চারি মাস বাস করিয়াছিলেন; উভয়েই শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীরঙ্গ-নিবাসী, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধের কোনও নির্দ্দেশ নাই, এবং গোপাল ভট্টের নামও অব্যক্ত! চৈতন্যদেবের অন্যান্য চরিতগ্রন্থে এ প্রসঙ্গ একেবারেই বর্ণিত হয় নাই।

তাহা হইলে, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "অন্যত্র ব্যক্ত" এই কথার দ্বারা বোধ হয় বুঝিতে হইবে যে, এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে কোনও বিবরণ না থাকিলেও, তিনি ইহা অন্য কোনও অর্ব্বাচীন পুস্তকে পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দাস-রচিত 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা[৫] সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনুরূপ। ইহাতে পাওয়া যায়, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লের গৃহে চাতুর্মাস্য করিবার সময় চৈতন্যদেব ত্রিমল্লের ভ্রাতা প্রবোধানন্দের উপর বালক গোপাল ভট্টের শাস্ত্রশিক্ষার ভার দেন, যাহাতে পরে গোপাল ভট্ট সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ হইয়া পিতামাতার বিয়োগান্তে বৃন্দাবনে গমন করেন। এখানে বেঙ্কটের নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাহাতে মনে হয়, নিত্যানন্দ দাসের মতে গোপাল ভট্ট ত্রিমল্লের পুত্র। মনোহর দাস-রচিত 'অনুরাগবল্লী'[৬] গ্রন্থেও যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নরহরির বর্ণনার

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

৩ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩।৪।

৪ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (তৃতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কলিকাতা, সন ১৩৩৭) ৩।১৫।১৪-১৬।

৫ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, সন ১৩১৮; অষ্টাদশ বিলাস দ্রষ্টব্য। ইহা ১৫২২ শকাব্দে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু এই তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

৬ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (কলিকাতা, ১৮৯৮), পৃঃ ৮-১২। ইহা বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। মনোহর দাসের মতে ত্রিমল্ল জ্যেষ্ঠ, বেঙ্কট মধ্যম ও প্রবোধানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টেরই পুত্র। যখন চৈতন্যদেব ইঁহাদের গৃহে চারি মাস অতিথি হইয়া ছিলেন, তখন গোপাল ভট্ট বালক নহেন, প্রাপ্তবয়স্ক। চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় তিনি পরে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। উপরোক্ত বিবরণগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও যথেষ্ট অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। নরহরিও যে এ-কথা জানিতেন না, তাহা নহে। তবে বিরোধ সত্ত্বেও মহাজনদিগের নিগূঢ় ও প্রাকৃত জনের দুর্বোধ্য বাক্যের উপর অশ্রদ্ধা করিতে নিষেধ করিয়াছেন (পৃঃ ১৪-১৫)—

শ্রীগোপাল ভট্টের এ সব বিবরণ। কেহ কিছু বর্ণে কেহ না করে বর্ণন।
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে। অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে।

তথাপি, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতাখ্যায়কগণের কেহ কেহ গোপাল ভট্টের দাক্ষিণাত্যে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতেন বলিয়া মনে হয় না; অন্তত এ-বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। ইহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যে যখন রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ পান, তখনও কিন্তু চৈতন্যদেবের সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্তও হয় নাই! এ-বিষয়ে নরহরির বিবরণের মধ্যেও সঙ্গতির অভাব রহিয়াছে। গোপাল ভট্টের সূচকে তিনি লিখিয়াছেন যে, রূপ-সনাতনের বৃন্দাবনে আগমনের পূর্ব্বেই গোপাল ভট্ট সেখানে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন।

'প্রেমবিলাসে'র মতে গোপাল ভট্ট পরে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সময় কোনও বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার অনুগামী না হওয়ায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, পরবর্ত্তী কালে যে সকল বর্ণনা লেখা হইয়াছিল, তাহা নানাবিধ কল্পনা ও জনশ্রুতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিয়াছেন, এবং নরহরিও এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (পৃঃ ১৫)—

প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে এ সব শুনিল।

বর্ত্তমান কালেও এই বিষয়ে নানারূপ মতবাদের অভাব নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিতায় জগদ্বন্ধু ভদ্র ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রচার করিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের তথাকথিত পিতা বেঙ্কট ভট্ট এবং বেদান্তপরিভাষার রচয়িতা ধর্ম্মরাজাধ্বরির গুরু বেলগুণ্ডি-নিবাসী বেঙ্কট ভট্ট বা বেঙ্কটনাথ একই ব্যক্তি। কিন্তু নামের সাদৃশ্য ভিন্ন ইহার সপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই। বেঙ্কট এই নামটি দাক্ষিণাত্যে অসাধারণ নহে, সুতরাং অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের আদি-নিবাস ছিল ভট্টমারি নামক কোনও গ্রামে; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে (মধ্য, ১।১১২; ৯।২২৪, ২৩১-৩৩০ ইত্যাদি) ভট্টমারি (পাঠান্তর 'ভট্টথারি') কোনও স্থানের নাম নহে,

একদল ভণ্ড সাধুর নাম বলিয়া দেওয়া আছে, যাহাদের চৈতন্যদেব মল্লারদেশে (মালাবর ?) দেখিয়াছিলেন।

গোপাল ভট্টের পিতৃব্য বলিয়া প্রবোধানন্দের উল্লেখ আরও রহস্যজনক। ইহা কেবল মনোহর দাস ও নরহরির কল্পনা বা শোনা কথা বলিয়া মনে হয়। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের[৭] প্রথমেই গোপাল ভট্ট আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিজের বংশ-পরিচয় বা প্রবোধানন্দের সহিত আত্মীয়তার কোনও কথা বলেন নাই। তিনি প্রবোধানন্দকে 'ভগবৎপ্রিয়' এই বিশেষণের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন, টীকাকার এই সমস্ত পদটি বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ, এই দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি তৎপুরুষ হিসাবে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবোধানন্দ চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, এইরূপ অর্থ হয়, এবং তাহা যদি হয়, তবে গোপাল ভট্টকে এই ভাবে চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য বলিয়া গণনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চৈতন্যদেবের কোনও চরিতগ্রন্থে বা মনোহর দাস ও নরহরির উল্লেখ ভিন্ন অন্য কোনও বৈষ্ণব-বিবরণে, গোপাল ভট্টের পিতৃব্য অথবা চৈতন্যদেবের ভক্ত হিসাবে প্রবোধানন্দের নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। প্রবোধানন্দ বা প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবভাব ও চৈতন্যানুরক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' অন্যান্য গ্রন্থগুলির অপেক্ষা অধিকতর সুপরিচিত[৮], ইহাতে ১৪৩ শ্লোকে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, অবতার প্রভৃতি দ্বাদশ বিভাগে চৈতন্যের বন্দনা ও গুণকীর্ত্তন রহিয়াছে। তাঁহার পঞ্চদশসর্গাত্মক 'সঙ্গীতমাধব'[৯] জয়দেবের অনুকরণে

---

৭ ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সংতোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ।
(রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিগ্‌দর্শনী টীকা সমেত, মুর্শিদাবাদ, সন ১২৯৬, ১২৯৮।)

৮ আনন্দীরচিত টীকা সহিত রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত (মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩৪)। ইণ্ডিয়া অফিস, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউট্ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার মিল নাই ; পাঠভেদও আছে। ৩৮ শ্লোকের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে স্তোত্রকার চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২ শ্লোকে চৈতন্যদেবকে 'গৌরনাগরবর' বলা হইয়াছে। অনেকের মতে ইহা নরহরি সরকার ও লোচনদাসের বর্ণিত নাগরভাবের অনুরূপ এবং সকলের রুচিগ্রাহ্য হয় নাই ; সেই জন্য প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রবোধানন্দের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট কিরূপে তাঁহাকে গুরু বলিয়া ব্যক্ত করিলেন ?

৯ ভক্তিপ্রভা-কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত (আলাটী, হুগলী, সন ১৩৪৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের যে পুথি আছে (নং ১৪০২), তাহাতে ১৫টি সর্গ আছে ; মুদ্রিত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে চারিটি অধিক শ্লোক আছে, তাহা পুথিতে পঞ্চদশ সর্গের পুষ্পিকার পরে পাওয়া যায় ; পৃথক্ সর্গে নিবদ্ধ নহে। গীতিগুলির শ্লোকানুক্রম ছাড়িয়া দিলে পুথির শ্লোকসংখ্যা ১৪১।

গীতিবহুল এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় পর্য্যবসিত। 'বৃন্দাবনমহিমামৃত'[১০] নামক আর একটি শতক-কাব্য তাঁহার নামে প্রচলিত আছে, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—নানাবিধ ছন্দে কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের বর্ণনা। ইহা নাকি এক শত শতকে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ষোলটি মাত্র শতক পাওয়া গিয়াছে ও মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতেও প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া রহিয়াছে।[১১] কিন্তু আত্মীয়তার কথা দূরে থাকুক, এই পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে গোপাল ভট্টের গুরু ছিলেন, মনোহর দাস ও নরহরির উক্তি ভিন্ন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ দু-এক জন লেখক গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দকে 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'র রচয়িতা প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রবোধানন্দের সহিত কাশীতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার কৃপায় প্রবোধানন্দ এই নাম প্রকাশানন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। 'মুক্তাবলী'র প্রণেতা, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য, এবং তিনি যে চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় উক্ত গ্রন্থে নাই। কাশীতে কোনও প্রবোধানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের মিলন হয় নাই। যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসপরিপন্থী নৃত্যগীতাদির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তিনি যে মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ, তাহা কোনও চৈতন্যচরিতগ্রন্থে নাই। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, চৈতন্যদেবের ভক্তির উৎস

---

১০ হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী (হরিদাস বাবাজী), নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দীনেশচরণ দাস প্রভৃতির সম্পাদনায় বৃন্দাবনে ১৩৪০-৪৫ সনে প্রকাশিত। শতকগুলি বাস্তবিক পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড, এবং অনেক শতকে শতাধিক শ্লোকও রহিয়াছে। হেবর্লিন প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে (খ্রীঃ অঃ ১৮৪৭, পৃঃ ৪৩০) মুদ্রিত এবং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক স্বীয় কাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে (৩য় সং, কলিকাতা ১৮৮৮ পৃঃ ৩৩৩-৮৪) পুনর্মুদ্রিত ১২৬ শ্লোকাত্মক এবং একটি শতকে সমাপ্ত যে বৃন্দাবন-শতক পাওয়া যায় তাহাতে প্রবোধানন্দের নাম নাই, কিন্তু চৈতন্য বন্দনা আছে। উপরোক্ত অধুনাতন ষোলটি শতকসংগ্রহে এই শতকটি নাই। অনেকগুলি পুথির তালিকায় বৃন্দাবনশতকের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় একটি শতকে সমাপ্ত এই গ্রন্থ।

১১ আরও দুইটি গ্রন্থ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে পাওয়া যায়, যথা—'বিবেকশতক' (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *Notices*, vii, p. 261, no. 2510) ও 'গোপালতাপনী'র টীকা (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির তালিকা, vol. x, pp 158-59)। হুগলী ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে দুই খণ্ডে (২য় সং ১৩৩১, ১৩৪২) 'রাধারসসুধানিধি' নামক যে-গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রবোধানন্দের রচিত নহে। ইণ্ডিয়া অফিস, বডলিয়ন্ ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ইহার যে সকল পুথি আছে, তাহাতে ব্যাসপুত্র হিতহরিবংশ ইহার রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত। হিতহরিবংশ রাধাবল্লভী সংপ্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুদ্রিত পুস্তকে যে প্রথম ও শেষ শ্লোকে চৈতন্যবন্দনা আছে, তাহা উক্ত পুথিগুলিতে নাই। মুদ্রিত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ২৭২, কিন্তু পুথিগুলির শ্লোকসংখ্যা অন্যরূপ।

কাশীর মত জ্ঞানপ্রধান স্থানকে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। কারণ, চৈতন্যের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলাইয়াছেন (মধ্য, ২৫।১৬১-৬২)—

কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালি। কাশীতে গ্রাহক নাই বস্তু না বিকায়।

বৃন্দাবন দাস এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু প্রকাশানন্দ যদি চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে প্রকাশানন্দের সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস যে রুক্ষ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন (মধ্য, ৩ ও ২০), তাহা নিতান্ত অসমীচীন ও অবৈষ্ণবোচিত। মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপূর প্রকাশানন্দের নামও করেন নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গোপাল ভট্টের যে-ইতিহাস বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা একেবারেই পরিষ্কার বা সুসঙ্গত নহে। কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ নহে। 'হরিভক্তিবিলাস' যে গোপাল ভট্টের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা, তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে, কিন্তু সে-কথা পরে বলিতেছি। 'হরিভক্তিবিলাস' ভিন্ন আর একটি রচনা ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী ও মনোহর দাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিপরীত। এই রচনাটি হইতেছে লীলাশুকরচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' স্তোত্রকাব্যের কৃষ্ণবল্লভা নাম্নী টীকা। নরহরি চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন (পৃঃ ১৬)—

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি।

ইহার পূর্ব্বে মনোহর দাস আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন (পৃঃ ১১-১২)—

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল। অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল।
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার। রসপরিপাটী যাতে সিদ্ধান্তের সার।
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক। লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোক।
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া। পুলকাদি অশ্রু বহে মুখ বুক বাঞা।

ইহার পরে, 'তথাহি শ্লোকৌ' বলিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থের দুই আদিশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোক গোপাল ভট্টের রচিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার সমস্ত পুথিতে[১২] প্রারম্ভে অবিকল পাওয়া যায়। ইহার প্রথম শ্লোকটি কৃষ্ণবন্দনা, দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গ্রন্থকার নিজেকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন[১৩]; কিন্তু এই টীকায়

১২ কৃষ্ণকর্ণামৃতের মূল এবং চৈতন্যদাসের সুবোধনী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকাদ্বয় সহিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার একটি সংস্করণ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক, পাঠভেদ, বিস্তৃত ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও সূচী সমেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইতেছে। কৃষ্ণবল্লভা টীকার জন্য কাশী সংস্কৃত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৬৬২ সংবতে লিখিত প্রাচীন পুথি এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অন্য একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথি, এই দুইটি দেবনাগরাক্ষরে লিখিত সম্পূর্ণ পুথি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত খণ্ডিত পুথি, সর্ব্বসমেত তিনখানি পুথি অবলম্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল সমস্যার সূচনা করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই সংস্করণের ভূমিকাদিতে দ্রষ্টব্য।

১৩ কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্। গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরঃ।

চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই ; এবং টীকার শেষে টীকাকার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত বঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থোক্ত পরিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্লোকটি এইরূপ—

শ্রীমদ্দ্রাবিড়নীবৃদ্দেবিধুঃ শ্রীমান্নৃসিংহোঽভব-
স্তৎপুত্রঃ শ্রীহরিবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
তৎপুত্রস্তু কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোলিনঃ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, দ্রাবিড়বাসী হরিবংশ ভট্ট টীকাকার গোপাল ভট্টের পিতা এবং নৃসিংহ তাঁহার পিতামহ। টীকার পুষ্পিকার পাঠও তদনুরূপ, যথা : "ইতি শ্রীদ্রাবিড়-হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টবিরচিতা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা ॥"—বলা বাহুল্য, এরূপ কোন শ্লোক বা পুষ্পিকা 'হরিভক্তিবিলাসে' নাই। মনোহর ও নরহরির মতে যদি এই দুই গোপাল ভট্ট একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বেঙ্কট-ত্রিমল্ল-প্রবোধানন্দের গল্প একেবারেই উড়িয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভা টীকার কথা অন্য কোনও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই।

হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও কৃষ্ণবল্লভার রচয়িতা গোপাল ভট্টের আরও দুইটি পুস্তকের পুথির সন্ধান আমরা পাইতেছি, যাহাতে উল্লিখিত শ্লোক বা অনুরূপ পুষ্পিকা রহিয়াছে। ইহার প্রথমটি হইতেছে, ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের রসিকরঞ্জনী টীকা।[১৪] ইহারও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিচয়ে[১৫] তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং ইহার একটি সমাপ্তি-শ্লোক কৃষ্ণবল্লভার উপরোদ্ধৃত শ্লোকের (শ্রীমদ্দ্রাবিড়°) সহিত অভিন্ন বলিয়া ইনিও যে হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহার পুষ্পিকাও কৃষ্ণবল্লভার পুষ্পিকার অনুরূপ।[১৬] গ্রন্থকার আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভাতে যেরূপ রূপগোস্বামি-বিরচিত চৈতন্যসংপ্রদায়ের রসশাস্ত্র উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা নাই, এবং বৈষ্ণব ভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবল্লভার মত এ-টীকাতেও চৈতন্যবন্দনা নাই। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, এই টীকার বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কোনও পুথি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—সবই দেবনাগরাক্ষরে লিখিত।[১৭]

---

১৪ এই টীকা সম্বন্ধে মল্লিখিত *Sanskrit Poetics*, vol. i, p. 252 দ্রষ্টব্য।

১৫ শ্রীমদ্গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা। ক্রিয়তে রসমঞ্জর্যাষ্টীকা রসিকরঞ্জনী।

১৬ ইতি হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরী টীকা রসিকরঞ্জনী সমাপ্তা।

১৭ যথা Mitra, *Notices*, iv, p. 294, no. 1712 ; Mitra, Catalogue of Skt. MSS. in the Library of the Maharaja of Bikaner (Calcutta 1880), p. 709, no. 1573 ; Eggeling, Descriptive Catalogue of Skt. MSS. in the India Office Library, iii, p. 357, no. 1228-29 ; Stein, Catalogue of Skt. MSS. in the Raghunath Temple Library of Jammu (Bombay 1894), p. 63, no. 748 ; Hultzsch, Report on the Search of Skt. MSS. in Southern India (Madras 1896), iii, p. 48, no. 1251 ; Peterson, Sixth Report, p. 92, no. 377 ; R. G. Bhandarkar, Report of

রাজেন্দ্রলাল মিত্র[১৮] এই গোপাল ভট্ট-রচিত 'সময়কৌমুদী' অথবা 'কালকৌমুদী' নামক এক স্মৃতিগ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন। ইহার একটি প্রারম্ভ-শ্লোকও[১৯] কৃষ্ণবল্লভা ও রসিকরঞ্জনীর দ্বিতীয় শ্লোকের অনুরূপ, তাহাতে গোপাল ভট্ট গ্রন্থের রচয়িতা ও তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, এই কথা পাওয়া যায়। ইহার পুষ্পিকাও[২০] বিভিন্নরূপ নহে। সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে লিখিত এই পুস্তকের উদ্দেশ্য হইতেছে নিত্যনৈমিত্তিক আচার, সংস্কার, দীক্ষা, ব্রত, উৎসব (যথা জন্মাষ্টমী), ভগবৎ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত্ত, দিন বা মাসের নির্দ্ধারণ। পুথিখানি ছাপা হয় নাই, কিন্তু বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ১২৪টি পত্র (folio) আছে, পৃষ্ঠায় ৯ লাইন। সুতরাং বইটি খুব ছোট বা সামান্য ছিল না, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না।

এই গোপাল ভট্ট যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মনোহর দাস কৃষ্ণবল্লভার প্রথম দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু যে-অন্তিমশ্লোক ও পুষ্পিকায় টীকাকারের বংশপরিচয় রহিয়াছে, তাহার কথা বোধ হয় জানিতেন না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপাল ভট্টকে স্বীয় শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি 'কৃষ্ণবল্লভা' তাঁহার শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্টের রচিত হয়, তবে ইহা বিস্ময়ের কথা যে, কৃষ্ণদাস স্বয়ং কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা নামক যে-টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা অভিহিত বা অনুসৃত হয় নাই, বরং কৃষ্ণদাস চৈতন্যদাসের প্রায় সমসাময়িক টীকাকে আত্মসাৎ করিয়া বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের কোনও বৈষ্ণব কর্ত্তৃক লিখিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব মত বা মূলের দাক্ষিণাত্য পাঠ ইহাতে গৃহীত হয় নাই, বরং বঙ্গীয় পাঠ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত স্পষ্ট অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী স্বয়ং ভগবান্, চৈতন্যসংপ্রদায়ের এই যে বিশিষ্ট মতবাদ, তাহা টীকায় উক্ত হইয়াছে। দ্বিভুজ নরাকৃতি, কিশোরমূর্ত্তি, বৃন্দাবনকেলিকার কৃষ্ণের উপাসনাতেও টীকাকার ভক্তিমান্। চৈতন্য-নমস্ক্রিয়ার অভাব সন্দেহজনক হইলেও,

---

1891-95, p 46, no. 705 শেষোক্ত তালিকাদ্বয়ের দুইটি পুথি (no 453 of 1887-91 and no 705 of 1891-95) এবং স্বতন্ত্র সংগৃহীত আরও দুইটি পুথি (no. 244 of Visrambag i, and no. 207 of Visrambag i) পুনা ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে আমরা দেখিয়াছি।—বোম্বাই নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্রের কাব্যমালা পর্য্যায়ে রুদ্রভট্টের শৃঙ্গারতিলকের যে সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার পাদটীকায় (গুচ্ছক ৩, পৃঃ ১১১) গ্রন্থের সম্পাদক শৃঙ্গারতিলকের গোপাল ভট্ট-রচিত রসতরঙ্গিণী নামক একটি টীকার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ইহার অন্য কোনও বিবরণ বা পুথির সংবাদ পাওয়া যায় না।

১৮ *Notices*, vii, p. 254, no 2501 পুথিখানি খুব প্রাচীন নহে, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

১৯ শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা। ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ রম্যা সময়কৌমুদী।

২০ ইতি হরিবংশভট্টচরণশরণগোপালভট্টকৃতা কালকৌমুদী সমাপ্তা।

নিশ্চিত প্রমাণ নহে, কারণ, রূপগোস্বামীর দুইটি দূতকাব্য ও 'দানকেলিকৌমুদী' নাটকেও এইরূপ নমস্ক্রিয়া নাই। টীকাকার যে বঙ্গীয় বৈষ্ণবমতের সহিত পরিচিত, তাহার আর একটি নিদর্শন এই যে, রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই দুইটি চৈতন্যসংপ্রদায়ের প্রামাণিক রসগ্রন্থ এই টীকাতে নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ভক্তিরসামৃতে'র রচনার তারিখ ১৪৬৩ শকাব্দ, সুতরাং ইহার পূর্ব্বে এই টীকা লিখিত হয় নাই। যদি ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের উপাখ্যান বাদ দেওয়া যায়, তবে দুই গোপাল ভট্টের একাত্মতা স্বীকারে বিশেষ বাধা থাকে না।

অন্য দিকে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত 'হরিভক্তিবিলাসে', রচয়িতা তাঁহার পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করেন নাই, কেবল চৈতন্যনমস্ক্রিয়াপূর্ব্বক আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য এবং রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাসের প্রীতিকামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচনাভঙ্গীও স্বতন্ত্র। ইহা বিশটি বিলাসে বিভক্ত সুবৃহৎ বৈষ্ণবস্মৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে যুক্তিতর্ক নাই, বৈধী ভক্তির অঙ্গস্বরূপ প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবোচিত সদাচার, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, পূজাপদ্ধতি, মন্দিরসংস্কার, মূর্ত্তিগঠন ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের বিধিনিষেধ নির্দ্ধারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বিধিনিষেধের প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি হইতে বচন সঙ্গে সঙ্গে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতে এমন কতকগুলি মত ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা ঠিক চৈতন্যসংপ্রদায়ের অনুমোদিত বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বীজমন্ত্র, জপ ও উপাসনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূদ্রের শালগ্রামশিলা উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্ত্তিগঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা নাই। এই কৃষ্ণ চক্রধররূপে বর্ণিত, দ্বিভুজ মুরলীধর নহেন। এমন কি, কৃষ্ণের ধ্যানে রাধার উল্লেখ নাই! বৈষ্ণব স্মৃতির নিবন্ধ হইলেও, ইহাতে বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারাদির কথা নাই, যদিও প্রথমেই বৈষ্ণব দীক্ষার কথা আছে। গ্রন্থের উপর তন্ত্রের প্রভাব প্রচুর ও স্পষ্ট। উৎসব ও পার্ব্বণের মধ্যে, বৈষ্ণবগ্রাহ্য শিবরাত্রি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু (রঘুনন্দনের যাত্রাতত্ত্বেও অযুক্ত) রাসযাত্রা বর্জ্জিত হইয়াছে।[২১]

---

২১ 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' নামক আরও দুইটি স্বল্পায়তন বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান কালে গোপাল ভট্টের নামে গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ হইতে ছাপা হইয়াছে; কিন্তু এগুলি উক্ত দুই গোপাল ভট্টের কাহারও রচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমটিতে 'হরিভক্তিবিলাসে' অযুক্ত বিবাহাদি চতুর্দ্দশ সংস্কারের বিবরণ আছে; দ্বিতীয়টিতে বেশাশ্রয়বিধি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের পালনীয় ধর্ম্মাদির কথা আছে। মনে হয়, 'হরিভক্তিবিলাসে' যে-যে বিষয় বিবৃত হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে এই দুইটি স্মৃতিসংগ্রহ সংকলিত হইয়া গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম পুস্তকের পুথির সন্ধান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সংকলিত *Notices*, 2nd Series, i, p. 397, no. 395; ii, p. 209-10, no. 235, এই বিবরণে পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বিতীয় পুস্তকের কোনও পুথির খবর পাওয়া যায় না। 'সংক্রিয়াসার-

'হরিভক্তিবিলাস' যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের রচনা, তাহা গ্রন্থের আদিতে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত আছে, এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতে' ইহার নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা ভক্তিরসামৃতের রচনাকালের (শকাব্দ ১৪৬৩) পূর্ব্বেই সংকলিত হইয়াছে। 'হরিভক্তি-বিলাসে'র 'দিগ্‌দর্শনী' নামক একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও আছে, তাহা সনাতন গোস্বামীর লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু টীকাতে টীকাকারের নাম নাই। তথাপি মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে শুধু টীকা নহে, মূলগ্রন্থও গোপাল ভট্টের ব্যপদেশে মুখ্যত সনাতনের রচনা।[২২] নরহরি বলিতেছেন—

> করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হইল ভট্টমনে। সনাতন গোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে।
> গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিলা শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন।

মনোহর দাস আরও বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থটি সনাতনের লেখা, কিন্তু গোপাল ভট্ট পুরাণের বাক্য সংকলন করিয়া ইহার বিস্তার রচনা করিয়াছিলেন—

> শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল। সর্ব্বত্র আভোগ ভট্ট গোসাঞির দিল।
> শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস। ইহা সবায় সুখ দিতে হরিভক্তির বিলাস।
> সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান। সব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও (মধ্য, ১।৩৫, অন্ত্য, ৪।২২১) 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতনের লেখা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং মধ্যলীলার চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ইহার সমগ্র মর্ম্মার্থ সনাতনের শিক্ষাচ্ছলে চৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, ভাগবতের লঘু বৈষ্ণবতোষিণী টীকার অন্তে জীব গোস্বামী সনাতনের রচিত গ্রন্থগুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও 'হরিভক্তিবিলাস' ও তাহার টীকা সনাতনের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস ও জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কুত্রাপি সনাতনকে গ্রন্থকার বলা হয় নাই, বরং গোড়াতেই গোপাল ভট্ট স্বীয় নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের সন্তোষার্থে লিখিতেছেন। এই বিরোধ পরিহারের কোনও উপায় নাই। ইহা সম্ভব যে, স্বসংপ্রদায়ের অগ্রণী সনাতন স্বীয় সহকর্ম্মী ও সুহৃৎ গোপাল ভট্টকে এই গ্রন্থরচনায় (টীকা লেখা ছাড়া অন্যরূপেও) বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ ইহাতে কোথাও নাই, এরূপ সহায়তা যে গোপাল ভট্ট অনুক্ত রাখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবশ্য, এই সকল সংসারত্যাগী ভক্ত বৈষ্ণবগণ নিজ নাম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু জীব গোস্বামী স্বীয় 'ষট্‌সন্দর্ভ', ভট্টলিখিত সংক্ষেপের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন

দীপিকা' প্রথমে 'সজ্জনতোষিণী' পত্রিকায় (১৫-১৭ খণ্ডে) কেদারনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে সংস্কারদীপিকা সমেত দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ কর্ত্তৃক সম্প্রতি (কলিকাতা, ১৯৩৫) মুদ্রিত হইয়াছে।

২২ নিত্যানন্দের মত পরিষ্কার নয়, তবে তাঁহার কথা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, রূপ ও সনাতনের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বলিয়া ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সনাতনের ঋণ গোপাল ভট্ট স্বীকার না করিয়া আত্মনাম খ্যাপন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে দীনেশ-চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,[২৩] সনাতনের নাম 'হরিভক্তিবিলাসে'র রচনার সঙ্গে স্পষ্টভাবে জড়িত করা হয় নাই। তাহার কারণ, তিনি যবনসংসর্গে আসিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন এবং হয়ত সেই জন্য সনাতনের নামে বৈষ্ণব সদাচারের গ্রন্থ প্রচার করিলে ইহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গোপাল ভট্টের নামই গ্রন্থকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ কল্পনায় সর্ব্বপূজ্য বৈষ্ণব গোস্বামীদের উপর যে হীন চক্রান্ত বা বঞ্চনার অভিপ্রায় আরোপ করা হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও, এই কল্পনার মূলে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সনাতনের নাম যদি এরূপ বর্জ্জনীয় ছিল, তাহা হইলে তাঁহার ভাগবতের টীকা ও 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' কিরূপে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্ববৈষ্ণবগ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না, এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম রূপ, জীব, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত জড়িত হইয়া তাহাদের দূষিত করে নাই, বরং ভূষিত করিয়াছে। সনাতন ও রূপ যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, এই গল্পের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ইহা সত্য যে, তাঁহারা মুসলমান দরবারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে মুসলমানী নাম বা খেতাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে ইহার অধিক কোনও অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। জীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-পরিচয়ে তাঁহাদের কর্ণাট ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত বলিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বাক্য (পৃঃ ৪২-৪৩) যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা মুসলমান দরবারে চাকুরী করিলেও, পরম্পরাগত পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা বা শাস্ত্রালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং সামাজিক সম্বন্ধ ও আচার-ব্যবহারের জন্য রামকেলির নিকট বহু কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও, চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বেও তাঁহারা যে নবদ্বীপের বিদ্যাবাচস্পতির শিষ্য, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

> ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লইয়া। ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া।

পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণলীলা ও বৈষ্ণব মতের প্রতি প্রবণতা ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহাদের যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, তাহা বুঝা যায়। এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা দু-চারি দিনের শিক্ষায় আয়ত্ত হয় নাই, আজীবনের ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের ফল বলিয়াই মনে হয়।

---

২৩ *Vaisnava Literature,* Calcutta University 1917, pp. 37-38 , *Chaitanya and his Age,* Calcutta University 1922, p. 290. Kennedy, *Chaitanya Movement,* Oxford Univ. Press, 1925, p. 137-এ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে, চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহা তথ্যদর্শী ঐতিহাসিককে সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ও অন্যান্য স্থান হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকা, 'কালকৌমুদী' এবং 'রসমঞ্জরী'র 'রসিকরঞ্জনী' টীকা যে গোপাল ভট্ট লিখিয়াছেন, আত্মপরিচয় অনুসারে তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র। চৈতন্যসংপ্রদায়ের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলিতে এই সংপ্রদায়ের মতবাদ বা উহার রসশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই। বরং তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র দাক্ষিণাত্য পাঠ নহে, বঙ্গীয় পাঠই তাঁহার টীকায় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যদি নরহরি প্রভৃতি-কথিত বংশপরিচয় বর্জ্জন করা যায়, তবে ইঁহার সহিত পরবর্ত্তী গোপাল ভট্টের ঐক্য স্বীকার কঠিন নয়।

(২) তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম যে গোপাল ভট্টের নামে 'হরিভক্তিবিলাস' প্রচলিত, তিনি উপরোক্ত গোপাল ভট্টের সহিত অভিন্ন, তাহারও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। তাঁহার পরিচয় অস্পষ্ট ও ইতিহাস জনশ্রুতিমূলক, এবং বিভিন্ন জনশ্রুতির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। তিনি দাক্ষিণাত্যোদ্ভব ছিলেন কি না, তাহাও অনিশ্চিত, এবং তাঁহার যে বংশপরিচয় ও বৃত্তান্ত বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাতে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও বিরোধ রহিয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' তিনি নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু বংশ-পরিচয় দেন নাই। এই প্রবোধানন্দের ইতিবৃত্ত অতি সামান্য এবং ইনি স্তোত্রকাব্য-লেখক পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইনি গোপাল ভট্টের পিতৃব্য ছিলেন কি না, তাহাও নিশ্চিত নহে, এবং ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের যে উপাখ্যান নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যত্র তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

সম্প্রতি আরও দুই-একটি, খুব সম্ভব চৈতন্যসংপ্রদায়ভুক্ত, গোপাল ভট্টের আবিষ্কারে এই সমস্যা জটিলতর হইযাছে।[২৪] পুণা ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরে রক্ষিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র আর একখানি টীকার পুথি[২৫] পাওয়া গিয়াছে, তাহাও গোপাল ভট্টের

---

২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের বৃত্তান্তে আরও গোপাল ভট্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাদের এখানে ধরা নিষ্প্রয়োজন। Aufrecht-এর *Catalogus Catalogorum*-এ (কেবল গোপাল নাম ছাড়া) অন্ততঃ বার জন গোপাল ভট্টের নাম পাওয়া যায়।

২৫ MS. no 178 of 1879-80. এই পুথি শ্রীধর ভাণ্ডারকরের সংকলিত *Catalogue of the Collections of MSS. deposited in the Deccan College*, 1888, p. 135-এ তালিকাভুক্ত হইয়াছে; Deccan College-এর সমস্ত পুথি-সংগ্রহ এখন ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে রক্ষিত। এই পুস্তক Aufrecht-এর তালিকায় ধৃত হয় নাই।

রচিত। কিন্তু এই টীকা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, এবং এই গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, কিন্তু উপরোক্ত দুই গোপাল ভট্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পুথিখানি ১৪৫ পত্রে (folio) সমাপ্ত, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পৃষ্ঠামাত্রাযুক্ত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত, মূল ও টীকা দুই পুথিতে রহিয়াছে। টীকার নাম 'শ্রবণাহ্লাদিনী'। শেষের যে শ্লোকে টীকাকারের পিতার নাম লিখিত আছে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, যথা—

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দভজনত্যক্তাখিলার্থস্ত্র্যহঃ (? ত্রয়ঃ ?)
শ্রীমদ্ভাগবতার্থবিৎ সমভবদ্ ভদ্দনফণা (? উদ্যৎফণো ?) বিশ্রুতঃ।
শ্রীরাধারমণাঙ্ঘ্রিসক্তমনসা গোপালভট্টেন তৎ-
পুত্রেণ শ্রবণামৃতস্য রচিতা টীকাস্য সংপ্রীতয়ে॥

ইহার পরবর্তী শ্লোকে টীকাকার বলিতেছেন যে, তিনি নিজের ও আত্মসুহৃৎ বনমালী দাসের কর্ণদ্বয়ের এবং অনুজ লক্ষ্মীনারায়ণের কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন—

তৈরর্থরত্নৈর্বনমালিদাসমিত্রস্য কর্ণদ্বয়মাত্মনশ্চ।
বিভূষয়ামীহ তথৈব লক্ষ্মীনারায়ণস্যাপ্যনুজস্য কণ্ঠম্।

টীকাকারের গুরুর নাম নারায়ণ। ইহা বঙ্গীয় পাঠ অনুসরণে লিখিত, ইহাতে গীতগোবিন্দ (fol 22b) এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র (fol. 16a, 19a) নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং চৈতন্যসংপ্রদায়ের মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইনি অপর গোপাল ভট্টের কৃষ্ণবল্লভা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আরও একটি গোপাল ভট্টের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির তালিকার ভূমিকায় (p. xvii) রাধারমণ দাস-রচিত শ্রীধর স্বামীর 'ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকা' টীকার 'দীপিকা-দীপন' নামক একটি অনুটীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে রাধারমণ দাস আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীমদ্গোপাল ভট্টের দাস্যে সংসক্তমানস, রাধারমণ-(বিগ্রহ-)সেবী, এবং কৃষ্ণগোবিন্দের মিত্র। এই গোপাল ভট্ট কি 'হরিভক্তিবিলাস'-কার গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি?

পরমানন্দমতসংগ্রহ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

তান্ত্রিক উপাসনার বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে পরমানন্দমত বা পারানন্দমতের সন্ধান পাওয়া যায়। অপরিচিত অথচ কৌতুককর এই প্রস্থান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বোধ হয় একখানি মাত্র গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম পারানন্দসূত্র।[১] কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা বরোদা হইতে প্রচারিত গায়কোয়াড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় লোকলোচনের অন্তরালে এই মত-বিষয়ক আর একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোরম গ্রন্থের এক খণ্ডিত পুথি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুথিখানিতে কোনও পুষ্পিকা নাই এবং পুথিমধ্যে ইহার কোনও নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। পুথির প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে পুথির মালিক কাশীধামের রঘুনাথ মালবীয়ের নাম ও গ্রন্থের নাম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হস্তাক্ষরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থের নাম 'পরমানন্দমতসংগ্রহ'। এই গ্রন্থের ও প্রসঙ্গক্রমে পারানন্দমতের পরিচয়-প্রদানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রেষ্ঠ আনন্দ বা মহাসুখের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকার জন্যই এই মতবাদ পরমানন্দ বা পরমানন্দমত নামে পরিচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ এই মতবাদের প্রচারক আচার্য পরমানন্দের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে।

পরমানন্দের সময় ও পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ইঁহার এক মুখ্য (?) শিষ্য ও ভ্রাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিষ্যের নাম দেবানন্দ ও ভ্রাতার নাম নিত্যানন্দ।[২] গ্রন্থারম্ভে ইঁহাদিগকে প্রণাম করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু পরমানন্দ শিবের নামান্তররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বশিষ্ঠাদির সহিত কথোপকথনের প্রারম্ভে পরমানন্দের নাম পাওয়া যায়, তৎপরে সর্বত্র শিবের নাম। উপাস্য ও উপাসকের অভেদ সূচনার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে কি না, বলা যায় না। এই মতবাদে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—হিংসানিষেধ।[৩] পশুবলি তান্ত্রিক

---

১ পরানন্দপুরাণ বা পরমানন্দতন্ত্র নামক গ্রন্থের যে পুথি এশিয়াটিক সোসাইটী বা মান্দ্রাজ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে আছে, তাহাতে এই মতের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরানন্দপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক উপাখ্যান এবং পরমানন্দতন্ত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

২ দেবানন্দং চ তচ্ছিষ্যং নিত্যানন্দং চ ভ্রাতরম্। (পত্র ১ক)

৩ ইয়ানেব বিশেষোঽস্তি মন্মতে মুনিসত্তমাঃ।
ন ন্যাসো ন চ হিংসাস্তি জঙ্গমস্য জড়স্য বা॥ (৬ক)
হিংসাং কুর্যাত্তু বিহিতাং জড়স্যৈব ন চান্যতঃ।
আলভেত ছাগবরং যত্র স্যাত্তত্র পৈষ্টকম্॥ (৭খ)

উপাসনার—বিশেষতঃ শক্তিপূজার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সেই বলি এই মতে নিষিদ্ধ। অথচ এই মতে তান্ত্রিক বিধিগুলি উপেক্ষিত হয় নাই। তন্ত্রমতে যেখানে ছাগবলি বিহিত হইয়াছে, এই মতে সেখানে পিষ্টক-নির্মিত ছাগের বলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে রাজাদের সম্বন্ধে এ বিষয়ে অন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহা গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। পারানন্দমতে ন্যাস প্রভৃতি পূজার খুঁটিনাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ কোনও সঙ্কীর্ণতা এই মতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মতের যাঁহারা অনুবর্তী হইবেন, ন্যাস ও বলি ব্যতীত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত কোনও অনুষ্ঠানই তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।[৪] বস্তুতঃ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি এই উদারতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পারানন্দমতে তিনটী আচার বা মার্গ স্বীকৃত হইয়াছে—বামাচার, দক্ষিণাচার ও উত্তরাচার। বামাচার আবার উত্তম ও মধ্যম, এই দুই প্রকারের। উত্তম বামাচারে পঞ্চ মকারের তিন মকার মাত্র সমাদৃত হইয়াছে—মৎস্য ও মাংস, এই দুই মকার বর্জিত হইয়াছে।[৫] সুতরাং ইঁহাদের মতে মৎস্যমাংস, মদ্যমৈথুন হইতেও নিকৃষ্ট। বামাচারী উপাসকের নামের শেষে "নাথ" শব্দ থাকিবে। উত্তরাচারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই যে, ইহাতে ভিক্ষা ও সেবা নিষিদ্ধ হইয়াছে। উত্তরাচারী উপাসকের নামের অন্তে "আনন্দ" শব্দ থাকিবে। নরপতি পারানন্দমত অবলম্বন করিলেও যুদ্ধাদি করিতে পারেন, দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিতে পারেন—মুনিঋষিদের তপোবিঘ্নকারী হিংস্র ব্যাঘ্রাদিকে বধ করিতে পারেন—কালীর সম্মুখে বলি দিতে পারেন।[৬]

পারানন্দমতের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য প্রাচীন মুনিঋষিদের সহিত এই মতবাদের ঘনিষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। পারানন্দমতানুবর্তীদিগের মতে বশিষ্ঠ, নারদ, অগস্ত্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিগণ এই মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ও এইরূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বশিষ্ঠ কৌলাচার অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তন্ত্রগ্রন্থে সুপরিচিত। লোপামুদ্রা, অগস্ত্য প্রভৃতির নামের সহিত কোন কোন তান্ত্রিক মন্ত্র জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ও প্রকাশিত পারানন্দসূত্র সূত্রাকারে রচিত বিস্তৃত গ্রন্থ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট এবং অংশতঃ বিশৃঙ্খল। আলোচ্য গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও স্পষ্ট। ইহা হইতে পারানন্দমতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা জন্মে। মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথিখানি

---

৪ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তান্ ধর্মান্ কুরু বতানঘাঃ।
ন্যাসং সন্ত্যজ্য পূজাদি কার্যং বৈ মমতস্থিতৈঃ ॥
পরানন্দমতপ্রাপ্তির্যাবন্নৈবোপজায়তে।
তাবন্ন্যাসো যজ্ঞবিধৌ জঙ্গমস্য চ হিংসনম্ ॥৬২
পরানন্দমতে প্রাপ্তে ন [হি] কুর্য্যাদিদং দ্বয়ম্।

৫ বামাচারো দ্বিপ্রকারো মধ্যমোত্তমভেদতঃ।
উত্তমস্ত্রিপ্রকারো বৈ মধ্যমঃ পঞ্চভির্যুতঃ। (১২খ)

৬ বানপ্রস্থোপদ্রবকর্তৄন্ বন্যান্ হিংস্রান্ জন্তূন্ ব্যাঘ্রাদীন্ হন্যাদেব রাজা। (১৮খ)

মিলাইয়া পড়িলে অনেক সন্দেহ দূরীভূত হয়। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ ছন্দোবদ্ধ—মাঝে মাঝে গদ্য আছে। ইহার আয়তন প্রায় শতাধিক শ্লোক। তবে দুঃখের বিষয়, পুথিতে ইহার সকল অংশ রক্ষিত হয় নাই। ইহা মাঝে মাঝে খণ্ডিত। গ্রন্থের অধিকাংশ শিব (পরমানন্দ) ও অগস্ত্যাদির কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষাগত সাদৃশ্য অনেক স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া, উভয় গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকের হুবহু মিল আছে। এই প্রসঙ্গে পারানন্দসূত্রের কতকগুলি অংশের (৮।৭৪-৫, ৮।৭৯-৮০, ১৩।৮৯-৯০, ১৩।৯৬, ১৯।৩৯-৪০) সহিত আলোচ্য গ্রন্থের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মনে হয়, এগুলি উভয়ত্র প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রারম্ভে গণেশ, ভৈরব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য ও মহেশ্বর, এই ছয় দেবতা এবং মত-প্রবর্তক পরমানন্দ, তদীয় শিষ্য দেবানন্দ ও ভ্রাতা নিত্যানন্দ, এবং পারানন্দমতদীক্ষিত অগস্ত্য, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিবর্গকে প্রণাম করা হইয়াছে। উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপরে পারানন্দমতানুমোদিত পদার্থত্রয়ের নাম (পরমাত্মা, ঈশ্বর ও জীব) এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরগণও জীবের ন্যায় পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। পরমাত্মলোকই ইঁহাদের সকলের জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রলয়কালে কিন্তু জীবগণ সানন্দলোকে নীত ও রক্ষিত হন।[৭] সৃষ্টি-প্রকরণে পরমাত্মকর্তৃক জগৎসৃষ্টির পৌর্বাপর্য সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রভৃতি দেবগণ পরমাত্মকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং একে একে স্বতন্ত্র অধিকারে নিযুক্ত হইলেন। নারদ, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কিরূপে শিবের নিকট সমাগত হইয়া দক্ষিণ, উত্তর ও বামাচারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতঃপর তাহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দক্ষিণাচারে, নারদ ও অগস্ত্য প্রভৃতি বামাচারে এবং দেব ও দেবদেব নামক দুই ঋষি উত্তরাচারে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি শিষ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব তাঁহাদিগের নিকট নিজ মতের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করেন এবং দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। বিনা দীক্ষায় শিষ্য হইবার অধিকার জন্মে না, এ কথা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া হয়।[৮] তাঁহারা যথানিয়মে দীক্ষিত হন এবং কয়েক দিন দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া সংযতভাবে যাপন করেন। পরে তাঁহারা প্রার্থিত মন্ত্র প্রাপ্ত হন। সাদি সান্ত, সাদ্যনন্ত, অনাদ্যনন্ত—পদার্থের এই বিভাগত্রয় তাঁহাদিগকে এই

---

৭ তত্র লোকো মহান্ দিব্যঃ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ। যত্র গত্বা ন যাত্যত্র পুনঃ সংসারমণ্ডলে।
মুক্তাশ্চ চেশ্বরা যত্র রমন্তে চ যথাসুখম্। যত্র ধ্যানাসক্তচিত্তা ঃ নির্দেশক্রিয়া যুতাঃ॥
পরানন্দৈকদেশস্ত সানন্দশ্চেত্যুদাহৃতঃ। কৃতপাপান্ দুরাচারান্ কৃতপুণ্যাংস্তথৈব চ।
আগতে প্রলয়ে হ্যেতান্ সানন্দে স্থাপয়ত্যসৌ॥

৮ ন দীক্ষয়া বিনা মার্গং দদ্যাৎ কশ্চিৎ কচিচ্ছুভম্ ॥৫৬॥
তস্মাদ যূং মুনিশ্রেষ্ঠা ভবধ্বং দীক্ষয়া যুতাঃ।

প্রসঙ্গেবুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই জগৎ সাদি সান্ত, পরমাত্মা, জীব, ঈশ্বর, পরমানন্দলোক সেই স্থানের গাছপালা ও জল—এই সমস্ত অনাদ্যনন্ত, দিব্য দেহ সাদ্যনন্ত। আকাশ পরিচ্ছিন্ন, অপর ভূতগণের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) প্রতি অণু পরস্পর ভিন্ন।

নারদ অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ বামাচারে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগকে যথানিয়মে দীক্ষা দেওয়া হয় এবং বামাচারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়।

দেব ও দেবদেব নামক ঋষিদ্বয় উত্তরমার্গে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়। এই মার্গের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়[৯]—এই মার্গ অবলম্বন করিলে মানুষের নিকট অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিবে না—সেবাবৃত্তি আচরণ করিবে না—দুষ্কর্মকারী ব্যক্তির নিকট হইতেও অযাচিত দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। উত্তরমার্গে দীক্ষিত ব্যক্তির নাম আনন্দান্ত করিতে হইবে।

পারানন্দমতাবলম্বী রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিবেন—যথানিয়মে প্রজাপালন করিবেন—স্বরাষ্ট্র রক্ষা ও পররাষ্ট্র বশীভূত করিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধাদি করিবেন—আশ্রমের বিঘ্নকারী হিংস্র পশুদিগকে বধ করিবেন—কালীর সম্মুখে বলি দিবেন। ইহাতে তাঁহার পাপ হওয়া দূরে থাকুক, পুণ্য বৃদ্ধি হইবে।[১০] হিংসাবিরোধী পারানন্দমতে এ বিধান আপাততঃ বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুদ্রিত 'পারানন্দসূত্রে' (পৃঃ ২২।৬১-২) এই প্রসঙ্গে একটী সুন্দর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অযোধ্যারাজ সুদর্শন বশিষ্ঠ কর্তৃক শাক্ত পারানন্দমতে দীক্ষিত হইলে সমীপবর্তী প্রদেশের রাজবর্গ তাঁহাকে অহিংসক মনে করিয়া আক্রমণ করিলেন—সুদর্শনও যুদ্ধ করা উচিত কি না, বুঝিতে না পারিয়া বশিষ্ঠের নিকট সংশয় নিরাসার্থ উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিলেন,—"ন্যায়যুদ্ধ পরমানন্দমতাবলম্বীর পরম ধর্ম।" আলোচ্য পুথিতে এই উপাখ্যানের প্রথমাংশ খণ্ডিত—তাই বুঝিতে একটু অসুবিধা হয়। "বশিষ্ঠ ও সুদর্শন প্রণাম করিলে শিব অন্তর্হিত হইলেন" যুদ্ধাদিবিধানের পর এই কথা এ পুথিতে রহিয়াছে। এই জন্য মনে হয়, খণ্ডিত অংশে উপাখ্যানের পূর্বভাগ ছিল।

অদীক্ষিতায় যো দদ্যান্মন্ত্রং বা মার্গমুত্তমম্।
স পতেন্নরকে ঘোরে বর্ষাণামযুতং সমাঃ ॥৫৭॥
যথা হ্যনুপনীতায় কন্যাং দদ্যাদ্ বিমূঢ়ধীঃ।
তথা হ্যদীক্ষিতায়ৈনং দদন্মার্গং পতেদ গুরুঃ ॥৫৮॥

৯ নেচ্ছেদ্ধনং মনুষ্যেভ্যঃ সেবাবৃত্তিং চরেন্ন চ।
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্মণঃ ॥৮৩॥

মুদ্রিত গ্রন্থে "অযাচিতাহৃতং" স্থলে "অযাচিতাদ্রুতং" এই পাঠ আছে। তাহা শোভন বলিয়া মনে হয় না।

১০ যো দণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্ রাজা সম্যগ্ বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের 'ঐকান্তী' ভক্ত ছিলেন—ভক্তৈকান্তিনো মুখ্যাঃ। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিতেছেন :—

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন,—"বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

এই মহনীয় কৃষ্ণস্তুতিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হউন বা না হউন" কিন্তু তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন, "আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাস আমি লুকাই নাই।" পুনশ্চ—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে"* ('কৃষ্ণচরিত্র'—উপক্রমণিকা)। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ ভাবে বলিয়াছেন, "প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ('কৃষ্ণচরিত্র'—প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিপুণভাবে বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপক মাত্র নহেন।† তিনি গৌরদাস বাবাজির মুখে ('প্রচার' ১২৯২, আষাঢ়) বলিতেছেন :—"আমার

---

* অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু, ঈশ্বরের অবতার—এ কথা বলা হইয়াছে সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, 'মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" —গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৩।

† ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় "প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্মস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম-প্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে পরিণত হইল।* ধর্মরাজ্য সংস্থাপন জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। মনুষ্যত্বের উপাদান আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। ঐ বৃত্তিগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। মনুষ্যত্বের জন্য ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা সমঞ্জস হওয়া চাই। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলিতেছেন:—

সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা-সাধন অতি দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী; আমরা শরীরী। দ্বিতীয়তঃ-তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।—১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

এই সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ। আমি কৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য আদর্শকর্মী।—গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৭।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন:—

কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস-শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথা, 'ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।

এই ধর্মসংরক্ষণ কেবল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারাই হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র-স্বরূপ রত্ন-ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ পুরুষতত্ত্ব।—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

---

* যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।—'কৃষ্ণচরিত্র', চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ মানব। কারণ, সমস্ত মানবিক বৃত্তি তাঁহাতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস।* 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে' অনুশীলন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন :—

অনুশীলন ধর্ম্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয় কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এ জন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়।

এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History-তে) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যিশুখৃষ্ট খৃষ্টিয়ানের আদর্শ এক কালে ছিলেন শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকেই নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি নারদাদি দেবর্ষি বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন, কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত, শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছেন, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্য-ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত, তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত।
—'ধর্ম্মতত্ত্ব', চতুর্থ অধ্যায়।

---

* কৃষ্ণ যখন আদর্শ মনুষ্য তখন তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্ত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই (কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জ্জনী, কি কার্য্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী)।...এই রাসলীলা কৃষ্ণ ও গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ। কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। ('কৃষ্ণচরিত্র', ২য় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

কংসবধের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

এই কংসবধেই দেখি—কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মনুষ্য।—'কৃষ্ণচরিত্র', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

.. যিশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম-প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যিশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

পুনশ্চ—যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই আদর্শ মনুষ্য।—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ যে আদর্শ মানব, বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' এ কথা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্মপ্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ।...যিনি এইরূপে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ—তিনিই আদর্শ পুরুষ।

'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ-বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন সুরক্ষিত.. কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই... সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধাগণ পটু ছিলেন না কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—জরাসন্ধ-যুদ্ধে এবং রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী-নির্মাণে। সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল যে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম (বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায়) ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত তাঁহার বুদ্ধি সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্বজ্ঞ .

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকলও চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং সর্ব কর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম ও সত্য যে অবিচলিত, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও প্রীতিও এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না—কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ,—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোক-হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী। . .

যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন—তিনি অন্ততঃ বলিবেন, কৃষ্ণ was "the wisest

and greatest of the Hindus"—আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীত ভাবে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্ বা কারণাকারণাৎ ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্ ।

এ সকল কথার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার বিশ্বাস, যিনিই নিবিষ্ট ভাবে 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করিবেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সুর মিলাইয়া বলিবেন—কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ চরিত্র বটে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব—সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার, সর্ববলাধার, সর্বরসাধার—তাঁহাতে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সু-সমঞ্জস। কিন্তু তাহাতে কি সিদ্ধ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার? সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।" এবং "মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যখন সম্পূর্ণ আদর্শ মূর্তিবিশিষ্ট, তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, যাঁহারা ঈশ্বরের সারূপ্য-প্রাপ্ত—গীতায় ভগবান্ যাঁহাদের 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' বলিয়াছেন, তাঁহারাও প্রয়োজনবশে ঊর্দ্ধলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, যাঁরা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ,' তাঁরা ঈশ্বর না হইলেও আদর্শ পুরুষ—কারণ, তাঁহারা 'পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং'—তাঁহারা যিশু-খৃষ্টের ভাষায় "are perfect as our Father in Heaven is perfect"—পরব্যোমে পরমপিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ।

পরব্যোমে পরমপিতা—সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সম্পূর্ণ—পূর্ণম্ অদঃ! এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম একাধারে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছল প্রস্রবণ—যুগপৎ অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা ও অজস্র প্রেমের অফুরন্ত উৎস—"is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Bliss"

জীব যখন ব্রহ্মখণ্ড—মমৈবাংশঃ, "made in the image of God," ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু—তখন জীবে নিশ্চয়ই "অস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্"। কিন্তু ব্রহ্মে যাহা প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন,—ব্রহ্মে যাহা বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। এ ভাবে ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২)। কিন্তু জীবের নিয়তি এই যে, কালক্রমে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে—ঐ সকল অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনা সুব্যক্ত হইবে—ঐ সুপ্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া জীব শিব হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মসারূপ্য—খৃষ্টানী ভাষায় Deification ("The wonder of wonders is the human made Divine.")। ইহাই গীতার "মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ"। তখন স্ফুলিঙ্গ সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি হয়, বিন্দু সম্প্রসারিত হইয়া সিন্ধু হয়। যাঁহাদের আমরা অবতার বলি—তাঁহারা কেহ কেহ ঈশ্বরের অবতার বটেন, কিন্তু অপরে এইরূপ আদর্শ পুরুষ—Deified Men—ব্রহ্মের সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্তাত্মা।

শ্রীকৃষ্ণ কি ঈশ্বরের অবতার অথবা ঐরূপ সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অবতার? আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বরের অবতার। কিন্তু ঈশ্বরাবতার হইলেও শ্রীকৃষ্ণ

(বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) "মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।"* 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত কার্য্য দ্বারা বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
মনসৈব জগৎস্মৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়ম্ উদ্যমবিস্তরঃ।
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টাম্ ইত্যেবম্ অনুবর্ত্ত‍তঃ।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২২।১৪-১৭

"জগদীশ্বর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার এইরূপ লীলা। যিনি সংকল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টি সংহার সম্পন্ন করেন, অরিক্ষয় তাঁহার তুচ্ছ কার্য্য। তথাপি লীলাবশে মনুষ্যদেহধারীর অনুরূপ তাঁহার ক্রিয়া।"

এবং সমাদরের সহিত অধ্যাপক ল্যাসেনের ও উইল্‌সনের মত উপন্যস্ত করিয়াছেন :—

It is true that in the epic poems both Rama and Krisna appear as incarnations of Visnu but they at the same time come before us as human heroes acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. Lassen

He [Krisna] exercises no superhuman faculties in defence of himself or his friends or in the defeat and destruction of his foes.—Wilson

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষ শক্তিদ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের এক জন নিবিষ্ট পাঠক। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, আমার বিশ্বাস, মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন হইলে অতিমানুষ শক্তির প্রয়োগ করিতেন এবং তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিলঙ্ঘন করিতেন। গীতায় উল্লিখিত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন ইহার জাজল্য উদাহরণ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের কশ্মল অপনোদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাকে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

---

* "প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত" প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথাই বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতাররূপে কল্পিত হইলেও মানুষের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই।"

যোগেশ্বর' কৃষ্ণের ইহা অতিমানুষ কার্য্য নহে কি? কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, ঐ ব্যবধান বিবিধ দৈবশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত।* ঐ দৈবশক্তি পরস্পর বিবদমান। ঐ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়কে আমরা এ দেশে দেবাসুর বলি—খৃষ্টানের Good and Evil Angels। সয়তান বা Ahriman কবিকল্পনা নহে—বস্তুতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিবর্ত্তনের ঋতমার্গের পরিপন্থী নিঋতি বা Dark Powers আছে। পুরাণ-ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন ঐ বামমার্গী অসুরশক্তি অবতীর্ণ হইয়া বিবর্তনের গতিরোধ করিয়া ধরাকে ভারাক্রান্ত করে, তখন ধরিত্রীর আকুল আহ্বানে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।

—ভাগবত, ২।৭।২৬

ইহাই গীতার "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"। কৃষ্ণ অবতারের পূর্বেও ঠিক ঐরূপ ঘটিয়াছিল। কয়েক জন প্রবলপরাক্রান্ত অসুর কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া উন্নতির পথ অর্গল-বদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করিতে তাহারা যে মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত কিছু করে নাই—ইহা সম্ভব নহে। তাহাদের কৃত বাধা অপনোদন করিয়া ধরার ভার লাঘব করিতে যদি শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে দৈবশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে অবিশ্বাসের কি আছে? বিশেষতঃ যখন বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার রচনার নানা স্থানে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পাঠককে শুনাইলাম। এইবার আমার বক্তব্য বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধর্মজগতের প্রধান প্রহেলিকা—greatest mystery, অত্যদ্ভুত রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই জটিল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। কথাটার একটু বিস্তার করি।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঋষিরা বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই Triple Logos-এর প্রকাশগত প্রভেদের উপদেশ করিয়াছেন। বিষ্ণু কে? বিষ্ণু "ক্ষৌণীভর্ত্তা"—অর্থাৎ আমাদের ভূমণ্ডলের অধিদেবতা (Planetary Logos),—বৈষ্ণব পরিভাষায় ক্ষীরোদশায়ী বা শ্বেতদ্বীপপতি। আমাদের পৃথিবীর যেমন ভর্ত্তা (Planetary Logos) আছেন, সৌরমণ্ডলভুক্ত মঙ্গল বুধ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহেরও সেইরূপ অধিপতি আছেন। তাঁহারা সেই সেই গ্রহের অধিদেবতা (Planetary Logos)।

তাঁহাদের সকলের উপরে সৌরমণ্ডলের অধিপতি মহাবিষ্ণু বা সূর্য্যনারায়ণ—যোঽসৌ আদিত্যে পুরুষঃ (উপনিষদ্)—Solar Logos—যিনি

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।

বৈষ্ণব পরিভাষায় ইনি গর্ভোদশায়ী বা চতুর্ভুজ নারায়ণ।

* এই সম্পর্কে আমার *Philosophy of the Gods* গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা আছে।

কিন্তু সৌরমণ্ডল (Solar system) ত' একটি নয়—অগণ্য। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশে বিলম্বিত রহিয়াছে—কারণ, প্রত্যেক তারা এক একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র—"Each star is a sun and as such the centre of a solar system."

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।

বরং সমুদ্রসৈকতের বালুকণা গণিয়া শেষ করা যায়—কিন্তু অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের গণনার শেষ হয় না—

সংখ্যা চেৎ রজসাম্ অস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন।

ঋষিরা বলেন, প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা Solar Logos আছেন—ইঁহারা প্রত্যেকে ত্রিমূর্তি বা Trinity—তিনেই এক, একেই তিন।

প্রতিবিশ্বেসু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।

কিন্তু এই সমস্ত ঈশ্বরের উপর এক জন মহেশ্বর পরমেশ্বর আছেন—তিনিই Central বা Supreme Logos—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—জগদণ্ডচয়া যদঙ্গঃ—তিনি অগণ্য ঈশ্বরের একমাত্র ঈশ্বব—এক এব মহেশ্বরঃ।

তম ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর

ইনিই বেদান্তের পরব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্—বৈষ্ণব পরিভাষায় কারণার্ণবশায়ী বা গোলোকপতি।

এখন প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতার, তবে কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের? এ সম্পর্কে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়।

আমরা দেখি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন :—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥—৭।৭
"আমা হতে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়।
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয়।"

সভাপর্বে ভীষ্মদেবের মুখে শুনি—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাম্ উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বম্ ইদং ভূতং চরাচরম্॥—২৮।২

"শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের অব্যয় উৎস—তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব।"

ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মার উক্তি এই :—

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ।
এতদ্ অক্ষরম্ অব্যক্তম্ এতদ্ বৈ শাশ্বতং মহঃ॥—৬৬।৬

"কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, কৃষ্ণই পরম যশঃ (glory), কৃষ্ণই অব্যক্ত অক্ষর, কৃষ্ণই সনাতন তেজঃ।"

এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বর, পরমেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

আবার দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য-নারায়ণ বা Solar Logos-এর সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—

যশ্চ নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীৎ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥
—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৭।৭১

—'যিনি দেবদেব সনাতন নারায়ণ, তাঁহারই অংশ নরলোকে প্রতাপশালী বাসুদেব হইলেন।'

অর্থাৎ এ মতে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু—সূর্য-নারায়ণ (Solar Logos)।

অন্যত্র দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বা Planetary Logos বলা হইতেছে—

তথৈব ভৃগুশাপাদ্ বৈ ভগবান বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ॥—দেবীভাগবত।

—'ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু ভৃগুশাপে অংশের দ্বারা বসুদেবপুত্র হইবেন।'

সে জন্যই প্রশ্ন করিতেছিলাম—শ্রীকৃষ্ণ কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের?

সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়—যখন শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থলে দেখি, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ-ঋষির সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—সেই নারায়ণ-ঋষি, যিনি সত্য যুগে সখা নর-ঋষির সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥
—মহাভারত, বনপর্ব, ৪০।১

বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয় লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি।

ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণৌ পুরুষোত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সংভূতাবমিতদ্যুতী॥—ভীষ্মপর্ব্ব ৬৬।১১

—'সেই পুরাতন অমিততেজাঃ ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ সম্প্রতি (দুষ্ট বধের জন্য) মনুষ্যলোকে (কৃষ্ণার্জুন-রূপে) আবির্ভূত হইয়াছেন।'

উদ্যোগপর্বেও এই কথার উল্লেখ আছে—

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ।
অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ।

—'মহারথ বীর কৃষ্ণার্জুন সেই পূর্ব-দেব নরনারায়ণ। তাঁহারা সংযুক্ত হইলে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুরেরও অজেয়। সেই নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ এবং নরঋষি অর্জুন।'

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জুনকেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ। প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।—উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ৯৬।৪৬

—'এই যে বীরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, ইহারা সেই নর ও নারায়ণ ঋষি।'

ঐ উদ্‌যোগ পর্ব্বের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী।

—'হে অর্জুন। তুমি দুর্দ্ধর্ষ নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই নারায়ণ ঋষি, কালক্রমে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি।'

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, যুগ-প্রয়োজনে নর-ঋষি অর্জুনের দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নারায়ণ-ঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেন কিরূপে?

এ সকল আপাত-বিরোধী মতের সমন্বয় কি? শ্রীকৃষ্ণকে একই নিশ্বাসে যে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইল, তাহারই বা সমাধান কি? এ প্রশ্নের আমি আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি এবং আদরের সহিত, বৈকুণ্ঠগত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহের 'চৈতন্যকথা' হইতে ঐ ভক্তপ্রবরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি :—

কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই মর্ত্যলোক। এই মর্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথা? ...তাই ঋষির মধ্যে মহাঋষি, জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ত্রিজগতের গুরু অর্দ্ধ-মনুষ্য অর্দ্ধ-দেবতা নারায়ণ ঋষির অপেক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোষ (physical vehicle) নারায়ণ-ঋষি। জন্মের সময়েও তিনি নারায়ণ-ঋষি এবং অন্তর্ধানের সময়েও তিনি নারায়ণ-ঋষি। বৃন্দাবনলীলায় তিনি গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ। মথুরালীলায় তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ।

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণরূপধারী নারায়ণ-ঋষির শরীরে যে ঐশ তেজের আবেশ হইত, তাহারও তারতম্য ছিল। মোটামুটি, মথুরালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা বিষ্ণুর তেজঃ; দ্বারকালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহাবিষ্ণুর তেজঃ, এবং বৃন্দাবনলীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহেশ্বরের তেজঃ। অধিকন্তু ঐ তেজেরও আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিত—'যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।'

এই যে আবেশ—ইহার পাশ্চাত্য নাম control বা possession।*

বলা বাহুল্য, নারায়ণ ঋষি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পার্থিব উপাধি—তিনি ভগবানের 'সাধর্ম্যম্ আগতঃ' সিদ্ধ পুরুষ—"Perfect as our Father in Heaven is perfect" :—

* এই আবেশ কিরূপে সিদ্ধ হয়, "বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব" প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

তাঁহাতে ভগবানের সৎ-ভাব, চিৎভাব ও আনন্দ ভাব, তাঁহার সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি, তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহার সমস্ত মানবিক বৃত্তি—কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জনী, কি কার্য্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী—সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস—এক কথায় তিনি আদর্শ মানব—শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ। সে জন্যই তিনি কৃষ্ণাবতারে ঐশ তেজের বাহন হইতে পারিয়াছিলেন। অন্যথা শৌণ্ডিকের ভাণ্ড কি স্বর্গসুধার ভাজন হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই ভাবে বুঝিলে সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায় এবং আমরা বুঝিতে পারি, কেন ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলিতেছেন—

তং যোগিনং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।*
অবমন্যেৎ বাসুদেবং তম্ আহুঃ তামসং জনাঃ। —৬৬।২০

আরও বুঝিতে পারি, কেন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে এক নিশ্বাসে নারায়ণ-ঋষি এবং বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, সাধারণতঃ (ordinarily) শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য বটেন, তবে আদর্শ মানব—কারণ, সচরাচর তিনি নারায়ণ ঋষি এবং মনুষ্যভাবে কার্য্য করেন—কিন্তু সময় সময় যখন ঐ 'মানুষী তনু'তে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বরের তেজঃ প্রবিষ্ট হয়—যেমন গীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় কিংবা ভাগবতে ব্রহ্মমোহনের সময়—তখন তিনি ভগবান্—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অবতারতত্ত্ব বোঝা প্রয়োজন। অতএব আগামী বারে অবতারতত্ত্বের আলোচনা করিব।

---

* রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গেও আমরা শুনিতে পাই :—

বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।—যুদ্ধকাণ্ড, ১১৯।২৭

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা স্মার্ত্ত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য, এবং বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম আমাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এখনও কেহ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেকালের সাময়িক-পত্রাদি ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে তাঁহার কথা যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, এখানে তাহারই আলোচনা করিব।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে—১৮৪৫ সনের এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

> মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া* নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত† নামে খ্যাত ছিলেন, মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন; তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।
>
> বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্তু প্রত্যাগমনানন্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
>
> পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। রামমোহন রায় তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৩ শকে [১৮১৪ ?] কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্য অন্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

* শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভুলক্রমে "মালপাড়া" লিখিয়াছেন।

† হরিহরানন্দ সম্বন্ধে ১৯৩৪ সনের 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত আমার 'Hariharananda-Nath Tirthaswami Kulabadhuta" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষ প্রয়োজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান* ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।† বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ

* ১৮২০ সনে 'বঙ্গভাষাভিধান' নামে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অভিধান বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের স্বত্ব তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিকে তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। সোসাইটির চতুর্থ বর্ষের (১৮২০-২১) কার্য্যবিবরণের শেষে মুদ্রিত আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়-বিভাগের একটি দফা এই :—

Ram Chundro's Remuneration,
(including 120 Copies of his Obhidhan) ··· 300 0 0

এই অভিধান-প্রসঙ্গে পাদরী লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, "The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society"

† আত্মীয় সভা ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৯৩৫ সনের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত আমার "Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform" প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পর এক জন পত্রলেখক ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের *Bengal Harkaru and India Gazette* পত্রে লেখেন :—

> The liberal *vavustha* which he recently gave regarding the re-marriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers

কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সহমরণ-প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করিলে ঐ আইন রহিত করিবার জন্য যে আবেদনপত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লোকভয়প্রযুক্ত তিনি এরূপ করিয়া থাকিবেন ;—বিশেষতঃ এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপকদের অনেকেই সহমরণ-প্রথার অনুকূলে ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে রামমোহনের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবন

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৮২৭ সনের এপ্রিল মাসে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জিলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায়, কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। এই পদে এক জন যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। পনর জন প্রার্থীর মধ্যে তিনিই পরীক্ষায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচিত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৪ মে ১৮২৭* তারিখ হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ-সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইসের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

---

*Abstract of Salaries and Establishment of the Calcutta Government Sanscrit College on 1st May 1835. ইহাতে "Date of Appointment" স্থলে রামচন্দ্রের নিয়োগের এই তারিখ দেওয়া আছে।

> ...a public notification was issued, inviting the attendance of candidates at the Sanscrit College, for the purpose of undergoing an examination as to their respective qualifications for the office, as well as for obtaining certificates of proficiency as Pundit of the Court, the examination to be conducted by the Committee appointed by Government to determine the fitness of candidates for public appointment Fifteen individuals accordingly came forward on the occasion and they were duly examined by Mr Wilson and myself orally and wrote written answers to Law questions in our presence These exercises having been circulated to the other members of the Committee, and compared with the result of the oral examination, the Members concur in considering Ramchandra Vidyavageesha as eminently qualified for the situation and the Secretary begs therefore to recommend him as a fit person to succeed to the appointment of Smriti Professor in the Sanscrit College, vacated by the resignation of Kasinatha 16th May 1827

বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি

রামচন্দ্র দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি পদচ্যুত হন। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :—

কাশীর বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের জমিদারী-সংক্রান্ত একটি মামলায়, গবর্মেণ্ট ১৮৩৬ সনের ১লা আগষ্ট দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া পাঠান। পরবর্ত্তী ১৫ই আগষ্ট তারিখে রামচন্দ্র যথারীতি ব্যবস্থাপত্র দেন, এই ব্যবস্থাপত্রে সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেরও স্বাক্ষর ছিল।

এই ব্যবস্থাপত্র সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের নিকট ভ্রমাত্মক বিবেচিত হওয়ায়, বিদ্যাবাগীশকে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করাই সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ১৩ মার্চ ১৮৩৭ তারিখে ভারত-গবর্মেণ্টের সেক্রেটরী ম্যাকনটেন (W H.Macnaghten) বাংলা-সরকারের সেক্রেটরীকে যাহা লিখিয়া পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> In the opinion of the Governor General of India in Council the whole of the Pundits of the Sanscrit College who had signed the Vyavastah deserved to be removed from the College, but as they are not professors of the science of Law and as their offence may have amounted to nothing more than carelessness in testifying the accuracy of the opinion which has since been proved to be erroneous, it may be sufficient as an example that the professor of Law, Ramchandar Surmona be expelled, and that the rest be admonished as to the impropriety of their conduct

কর্ত্তৃপক্ষের এই আদেশ যথাসময়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারীদের মাহিনার খাতায় প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা পাইয়াছিলেন।

১৮ মে ১৮৩৭ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইংরেজীতে একখানি সুদীর্ঘ আবেদনপত্র গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে পেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি নিজের ব্যবস্থাপত্র যে নির্ভুল, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী বহু পণ্ডিতের—এমন কি, উইলসন সাহেবের নজীরের উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন :—

> That this order in Council was carried into effect on the 1st instant, and copies of the correspondence forwarded to your memorialist on the 12th instant by the College Secretary, and that your memorialist was thus expelled from the Institution, thrown out of employ, and degraded in the estimation of Society, without the erroneousness of his opinion having been pointed out to him or an opportunity afforded for his conviction, or for enabling him to justify himself before the Supreme authority by furnishing such explanations as might have been required.

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই। এ-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

> READ an extract from the General Dept No 74 dated the 21 June last transferring for consideration Petitions of the Dismissed Pundits of the Benares and Sanscrit Colleges praying restoration to office
>
> RESOLUTION On a full and careful reconsideration of all the opinions which have been delivered in this case the Right Honble the Governor General of India in Council is of opinion that they afford a strong *preponderating evidence, amounting to presumptive proof that the* dismissed Pundits were actuated by corrupt motives in the exposition of the Law on the point submitted for their opinion His Lordship in Council accordingly resolves that *their petitions be rejected.* Extract from the Proceedings of the Rt Honble the Governor General in Council in the Revenue Dept under date the 25 Septr 1837

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা' বলেন :—

> রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬১ শক।

দুইটি কারণে এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রামচন্দ্রের পদচ্যুতির সাত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় ১৮৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে কেবলমাত্র রামচন্দ্রই পদচ্যুত হন নাই—পরন্তু কাশী সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন পণ্ডিতেরও চাকরি গিয়াছিল।

এই সংক্রান্ত নথিপত্র পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি গবর্মেণ্ট সুবিচার করেন নাই। তাঁহার অনুরোধ সত্বেও তাঁহার ব্যবস্থাপত্রের ত্রুটি তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই; —তাঁহাকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

রামচন্দ্র শেষ-পর্য্যন্ত সুবিচার লাভের আশায় বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট

আবেদন করিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তিনি নিরপরাধী সাব্যস্ত হন। কিন্তু পূর্ব্বপদ* আর তিনি ফিরিয়া পান নাই, তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোন পদ শূন্য হইলে অগ্রে তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।†

যে-ব্যবস্থাপত্র লইয়া এত কাণ্ড, তাহা পাঠ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিতের কৌতূহল হইতে পারে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রশ্ন দুইটি-সমেত ব্যবস্থাপত্রখানি মুদ্রিত হইল।

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

১৮৩৯ সনের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এদেশে কুত্রাপি ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার একটি খণ্ড রক্ষিত আছে। তাহার সম্পূর্ণ ফোটো-প্রতিলিপি সম্প্রতি আনাইয়াছি, স্থানাভাবে বক্তৃতাটির কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> সভাস্থ মহাশয়দিগের মধ্যে যাহাদিগকে উপস্থিত দেখিতেছি তাঁহারা অনেকে পাঠশালার শিলারোপণের দিবস উপস্থিত ছিলেন, অদ্য পাঠারম্ভকালেও তাঁহারা এবং অন্যান্য মান্য বিজ্ঞ ধনাঢ্য বহুতর মহাশয়রা অধিষ্ঠিত আছেন এবং অস্মদ্দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়রা এই সভাতে উপস্থিত থাকাতে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিতেছে, যেহেতু ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কতিপয় লোকের এরূপ সংস্কার ছিল, যে রাজ্যাধিপতির স্বজাতীয় ভাষা প্রচারে যাদৃশ উদ্যোগ অনুরাগ এবং রাজস্বব্যয়, গৌড়ীয়-ভাষার প্রতি তাদৃশ নাই কিন্তু এইক্ষণে হিন্দুকালেজের অন্তঃপাতি এতৎ পাঠশালাসংস্থাপনে তাঁহাদিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান দর্শনে ঐ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বসংস্কারের নিবৃত্তির সম্ভাবনা, যেহেতু তাহারদিগের এইক্ষণে অবশ্যই প্রতীতি হইবেক যে মহানুভব ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের কদাচ এমত অভিপ্রায় নহে যে লোকোপকারিবিদ্যা কেবল তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভাষার অধীনে রাখেন, কারণ বিদ্যা এবং তৎসম্বন্ধি সংস্কার অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ভাষা সেই বিদ্যার বাহকস্বরূপ হইয়া মনেতে সংস্কার জন্মাইবার সাধন মাত্র, অতএব যে কোন ভাষা উক্ত সংস্কারজননে সক্ষম অথচ

---

* রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পদচ্যুত হইলে তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ ১৮৪০ সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাস হইতে ভরতচন্দ্র শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভরতচন্দ্র ১৮৩০-৩৭ সন পর্য্যন্ত হিন্দু আইন পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত, ১১ ডিসেম্বর ১৮৩৭ হইতে ২ নবেম্বর ১৮৩৯ পর্য্যন্ত সারণ জিলা-কোর্টের জজপণ্ডিত, এবং তৎপরে বর্দ্ধমান জিলা-কোর্টের জজপণ্ডিত ছিলেন।

† রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত নথিপত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আছে। এ-সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষের আদেশাদি ভারত-গবর্মেণ্টের দপ্তরে দেখিয়াছি (Public Dept. Procdgs. 5 Aug. 1840, Nos. 17, 18, 20; 19 Aug. 1840)

অনায়াসলভ্য তাহাই লোকের বিদ্যাজননের কারণ হইতে পারে, বিশেষত প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিকপ্রত্যক্ষ যুক্তি সাহায্যে বিবেচনা করিলে এমং কদাচ সম্ভব হয় না যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষ যাহার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চতুরস্রক্রোশ, এবং যাহাতে প্রায় দশকোটি মনুষ্য বাস করিতেছে এবং যদ্দেশীয়ব্যক্তিরা স্ব২ ভাষাতে লৌকিককর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এতাদৃশ প্রশস্ত রাজ্যের উক্তসংখ্যক লোকেরা কেবল ইংলণ্ডীয়ভাষাবলম্বনে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সভ্যতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেক।

* * *

সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয়ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা হওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিকভাষা নহে কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জ্জন বহুকাল ও বহুপরিশ্রমসাধ্য, অতএব দেশান্তরীয়ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা সকল সংস্কৃতভাষার অবলম্বনে বর্ত্তিবার সম্ভাবনা, একারণ দেশস্থ সাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হওনে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, এইহেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাদ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালনদ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।

* * *

এতৎ পাঠশালাতে যে২ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা কথিত হইল, এবং বালকেরা ঐ সকল বিদ্যাতে পারগ হইলে যেরূপ বিদ্বান্ হইতে পারিবেক তাহা সভাস্থ মহাশয়দিগের অবশ্য অনুভূত হইয়াছে। এই গুরুতর প্রার্থনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে যেসকল শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানকর্ম্মের ভার হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সহকারীও দিয়াছেন আমিও আহ্লাদ পূর্ব্বক এই মহোপকারি বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়াছি।

এক্ষণে আমি আশ্বাস করি যে আমার অধ্যাপকতাবস্থায় এতন্মহোপকারি আদি পাঠশালাস্থ কতিপয় ছাত্র শৈশবাবস্থায় মাতৃক্রোড়রূপ সুখশয্যাতে উপদেশব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞ হয় এবং অস্মৎ শুভাদৃষ্ট বশত এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সুসম্পন্ন হইলে এমত প্রত্যাশা করি যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবেত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্ত-সম্বলিত মদীয় নাম সংকলন করিবেন।

অপর, বোধ হয় যে এতন্মহোপকারি কর্ম্ম সমাধার ভার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অস্মৎপ্রতি নির্দ্ধারিত ছিল এবং ইহাও তাঁহার মানস ছিল যে এতদ্দেশের পুনঃসভ্যাবস্থা মহাশয়দিগের দৃষ্টি গোচর হইবেক।

এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি তৎকালে হইবেক যৎকালে এতৎপ্রধান পাঠশালাহইতে সুশিক্ষিত ছাত্র ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের দেশে, নগরে, গ্রামে, এবং কুটীরদ্বারে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হইতে পারিবেক, সম্প্রতি এই সকল বাক্য মনঃকল্পিত প্রায় বোধ হইলেও ভবিষ্যদ্বাক্য যদি বিশ্বাস যোগ্য হয় তবে মদুক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য এতৎ শকাব্দীয় শতাঙ্ক পরিবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে অবশ্য সুসিদ্ধ হইবেক

এবং তৎকালে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমানা হইবেক।

এক্ষণে দেশনিয়মানুসারে প্রসিদ্ধ শ্লোকের আবৃত্তি পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

যস্যভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

যাহার নিয়মে বায়ু সর্ব্বদা বহিতেছেন ও যাঁহার ভয়ে সূর্য্য যথাযোগ্যকালে উত্তাপ দিতেছেন, এবং যিনি অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনি তাবতের প্রতিপালক হউন।

কলিকাতা।
৬ মাঘ সন ১২৪৬ সাল।

শ্রীরাম চন্দ্র শর্ম্মণঃ।
সংস্কৃত এবং গৌড়ীয়ভাষাধ্যাপকস্য
হিন্দুকালেজ পাঠশালা।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক

১৮৪১ সনের শেষাশেষি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই শূন্য পদের জন্য আবেদন করিলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

বিদ্যাবাগীশ ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কর্ম্মে যোগদান করেন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল (২ মার্চ ১৮৪৫) পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু

কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাবাগীশ পীড়াগ্রস্ত হন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার [২ মার্চ ১৮৪৫] দিবা অষ্ট ঘণ্টার সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের খাতায় দেখিতেছি, ১৮৪৪ সনের সেপ্টেম্বর

হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছয় মাস বিদ্যাবাগীশ ছুটি লইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থলে কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র গোবিন্দ শিরোমণি অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান। ১ বৈশাখ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। প্রধান উপাচার্য্য।

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ লইয়া বিতর্ক

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ লইয়া সম্প্রতি রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ ৫৮৬) বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রচারিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর তারিখ ১ মার্চ ১৮৪৫ "ঠিক নহে"—উহা ২৩ ফেব্রুয়ারি হইবে, কারণ, ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের 'বেঙ্গল হারকরা'য় এক জন পত্রলেখক এই তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন।* বিদ্যাবাগীশ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সভার মুখপত্রে প্রচারিত তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে চন্দ-মহাশয়ের উচিত ছিল—পূর্ব্বে এ-বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রচারিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ যে নির্ভুল, তাহার প্রমাণ দিতেছি।

বিদ্যাবাগীশ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সহিত সহ-সম্পাদক রূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৫ এপ্রিল ১৮৪৫ তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

> With reference to my letter dated 26th February last submitting for sanction a Bill for a moiety of salary of Ramchandar Bidyabageesha Assistant Secretary to this Institution retrenched by the Civil Auditor for the month of January last and order of Government dated 26th ultimo I have the honor to submit for sanction the enclosed Bill for a similiar retrenchment for February last
>
> 2. Ramchandar Bidyabageesha died on the 2nd March last

ইহা ছাড়া কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের হিসাবেও দেখিতেছি, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (১৮৪৫) মাসের পুরা মাহিনা তাঁহার হইয়া "শ্রীমতি পুণ্য দেব্যাঃ" সহি করিয়া লইয়াছেন। মার্চ মাস হইতে বিদ্যাবাগীশের স্থলে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত গোবিন্দ শিরোমণি পুরা মাহিনা ৫০৲ টাকা লইয়াছেন।

* 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও ১৩ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে এই পত্রলেখকের প্রদত্ত তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসাবে বিদ্যাবাগীশের খ্যাতি ছিল। গ্রন্থরচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য কম ছিল না। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১০ মাঘ ১২২৩ সাল=১৮১৭, জানুয়ারি। পৃ. ১৫৫।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের নাম ও নিবাস পাওয়া যায় :—

সেই সত্য পরাৎপরে বাক্যমন অগোচরে বিশ্বব্যাপি বিশ্বের কারণে।
দ্বিজরামচন্দ্র নাম বাস পালপাড়া গ্রাম নতিস্তুতি করি কায়মনে।
বারতিথিরাশিলগ্ন শুনিতে সকলে মগ্ন গৃহস্থের সদা প্রয়োজন।
সবিশেষ জানিবারে জ্যোতিষ অপেক্ষা করে এইহেতু করিয়া যতন।
শকে সপ্তদশশতে আটত্রিশ দিয়া তাতে সাধারণ বোধের কারণ।
জ্যোতিষসংগ্রহসার যথাশক্তি আপনার করিলাম ভাষাবিবরণ।
প্রথম স গ্রন্থ এই মনে বড় ভয় সেই যদি ত্রুটি থাকে কোনস্থানে।
শুধিবেন সাধুজনে কৃপা করি নিজগুণে দোষনাশে সাধু সন্নিধানে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ও রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে 'জ্যোতিষ-সংগ্রহসার' আছে।

২। **অভিধান**। মূল্য ১৲। ১৮১৮ (?)

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ৮ম পৃষ্ঠায় এই অভিধান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় :—

> A small volume has recently appeared, the design and contents of which are stated in an English and Bengalee advertisement prefixed The author, Ramchundur Surma, there remarks that he has constantly had occasion to observe in private correspondence and public documents *written in Bengalee the deficiency of his countrymen* (Pundits *only* excepted) in orthography ; which has induced him to collect as many Bengalee words as are derived from the Sunscrit, and are in most common use, and to publish them, with their definitions or synonymous words, in the form of a pocket volume This little work therefore, under the name of *Obhidhan*, (vocabulary) is intended to instruct the natives both in the spelling and the meaning of terms

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই অভিধানের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই।

এই অভিধানের বর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮২০ সনে প্রকাশিত হয়। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে, তালিকায় এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

"বঙ্গভাষাভিধান pp iv 516 Cal 1820. 12°"

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন এক এক খণ্ড 'বঙ্গভাষাভিধান' আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫১৬ নয়, কলম্-সংখ্যা ৫১৬, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম্।

(৩) **পরমেশ্বরের | উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান | শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক | ব্রাহ্ম সমাজ | কলিকাতা | বুধবার ৬ ভাদ্র | শকাব্দা | ১৭৫০ | [পৃ ৭]**

২য় ব্যাখ্যান (১৩ ভাদ্র), ৩য় (২০ ভাদ্র), ৪র্থ ('শনিবার ৩০ ভাদ্র'') ৫ম (৭ আশ্বিন), ৬ষ্ঠ (১৩ আশ্বিন), ৭ম (২০ আশ্বিন), ৮ম (২৭ আশ্বিন), ৯ম (১০ কার্ত্তিক), ১০ম (১৭ কার্ত্তিক), ১২শ (১লা অগ্রহায়ণ), উনসপ্ততি (১১ মাঘ শনিবার শকাব্দা ১৭৫১)।

এই ব্যাখ্যানগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩, কলিকাতা ১৭৫৮, আছে।

(৪) **বিবাদচিন্তামণিঃ।** ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাচস্পতিমিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি'র একটি "শোধিত" সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তক আছে।

(৫) **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা।** ৬ মাঘ ১২৪৬ (=১৮ জানুয়ারি ১৮৪০)। পৃ. ১৬।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র মিত্র-কৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদও এই পুস্তিকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অনুবাদে প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ ইংরেজী জানিতেন না।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তিকা আছে।

(৬) **নীতিদর্শন।** ১৮৪১।

(ক) নীতিদর্শন | উপদেশ | ১. সংখ্যা | হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। হিন্দু কালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। । পৃ ৯

(খ) নীতিদর্শন | পিতাপুত্রের পরস্পর কর্ত্তব্য | উপদেশ | ২ সংখ্যা | হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২৯ ফাল্গুণ ১২৪৭ সাল। হিন্দুকালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। । পৃ ১১ |

'নীতিদর্শন' পুস্তিকার এই দুইটি সংখ্যা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'নীতিদর্শনে'র ৩য়-৫ম সংখ্যা (একত্রে মুদ্রিত) আছে।

পরিশিষ্ট

কোন ব্যক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র আপন শ্রমের দ্বারা কএক গ্রাম লাভ করিল তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান এক স্ত্রী রাখিয়া মরিল তৃতীয় পুত্রের পুত্রও নিঃসন্তান এক স্ত্রী রাখিয়া মরিল এবং ঐ স্ত্রী এখন পর্য্যন্ত নিঃসন্তানা বর্ত্তমানা আছে ইহাতে জিজ্ঞাস্য করা যায় ১ প্রথম সওয়াল এই যে ঐ দ্বিতীয় পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং তৃতীয় পুত্রের পুত্রবধূর ঐ কএক গ্রামে অধিকার আছে কি না যদি থাকে তবে কি পর্য্যন্ত থাকে।

২ দ্বিতীয় সওয়াল এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ভগিনী পৌত্রের ঐ কএক গ্রামে অধিকার থাকে কি না ॥—

এই ব্যবস্থা বারাণস দেশের চলিত শাস্ত্রানুসারে দেওয়া যায় ইতি ॥—

১। কুরচীনামা

পুত্র নং ১	পুত্র নং ২	স্ত্রী	পুত্র নং ৩	স্বামী নং ৪	কন্যা নং ৪
নিঃসন্তান মৃত	নিঃসন্তান মৃত স্ত্রী রাখিয়া	বর্ত্তমানা	মৃত	মৃত	মৃতা
	স্ত্রী বর্ত্তমানা		৩ পুত্রের পুত্র নিঃসন্তান মৃত		৪ কন্যার পুত্র মৃত
					কন্যার পৌত্র বর্ত্তমান

এতৎপ্রশ্নদর্শনেন যাদৃশবোধো জাতস্তদনুসারেণোত্তরং লিখ্যতে।

প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং ॥

তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রমরণসময়ে দ্বিতীয়ভ্রাতা জীবতি বা দ্বিতীয়ভ্রাতুরুপরমকালে তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রৌ জীবত ইতি বিশেষঃ প্রশ্নদর্শনেন ন জ্ঞায়তে। তথাপ্যাদ্যকল্পে জীবতো দ্বিতীয়ভ্রাতুরবিভক্তগ্রামেঘধিকার ইত্যতস্তন্মরণানন্তরং বিভাগাৎসম্বন্ধবিরহাৎ ভ্রাত্রাদিরহিতপতিধনে দ্বিতীয়ভ্রাতৃপত্ন্যা এব তত্রাধিকারস্তয়া তৃতীয়ভ্রাতৃস্নুষায়ৈ গ্রাসাচ্ছাদনং দেয়ং। দ্বিতীয়কল্পেপি অবিভক্তেষু তেষু গ্রামেষু তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রয়োঃ ক্রমেণাধিকারস্ততস্তৃতীয়ভ্রাতৃমরণানন্তরং তৎপুত্রে মৃতে সম্বন্ধ্যন্তরাভাবাৎ তৎপত্ন্যা এব তত্রাধিকারঃ। দ্বিতীয়ভ্রাতৃপত্ন্যৈ তৃতীয়ভ্রাতৃস্নুষা ভক্তাচ্ছাদনং দদ্যাৎ ইতি পরন্তু স্ত্রীণামস্বাতন্ত্র্যাৎ যাবজ্জীবং তদ্ধনমুপভোক্তব্যং আবশ্যকপত্যৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াদ্যর্থং দানাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যং নতু নটনর্ত্তকাদিদানবিক্রয়াদিকমিতি বারাণস্যাদিদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়বিবাদচিন্তামণিপ্রভৃতিগ্রন্থসম্মতা ব্যবস্থেতি।

অত্র প্রমাণং ॥

অপুত্রধনাধিকারে, পত্নীদুহিতরশ্চেতি, পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেতেতি, অপুত্রধনং পত্নাভিগামীতি পত্নী ভর্ত্তুর্ধনহরীতি, অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণীতি, যাজ্ঞবল্ক্যবৃদ্ধমনুবৃদ্ধবিষ্ণুকাত্যায়নবৃহস্পতিবচনেষু প্রথমং পত্ন্যা ধনগ্রহণমুক্তং। ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াদিতি, পিতা হরেদপুত্রস্যেতি অনপত্যস্য পুত্রস্যেতি স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য ভ্রাতৃগামি দ্রব্যমিতি বিভক্তে সংস্থিতে দ্রব্যমিতি নারদমনুশঙ্খকাত্যানবচনেষু প্রথমং ভ্রাতৃপিতৃমাতৃপিতামহীপত্নীনামনন্তরস্য ধনসম্বন্ধো দর্শিতঃ। তত্র বচনানাং বিরোধপরিহারায় বিভক্তাসংসৃষ্টিন্যপুত্রে স্বর্যাতে পত্নী প্রথমং ধনং গৃহ্নতীত্যয়মর্থসিদ্ধো ভবতীতি তথা তস্মাদপুত্রস্য স্বর্যাতস্য বিভক্তাসংসৃষ্টিনঃ পরিণীতা স্ত্রী সংযতা সকলমেব ধনং গৃহ্নতীতি স্থিতং। ইতি মিতাক্ষরালিখনাৎ ভ্রাতৃপিতৃমাতৃপিতামহীনামভাবে বিভাগানন্তরমৃতপতিধনে পত্ন্যা অধিকারঃ প্রতীয়তে ইতি। পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয়মাতুলান্। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীংস্ত্রিয় ইতি বীরমিত্রোদয়ধৃতপ্রজাপতিবচনং ॥ ভরণঞ্চাস্য কুর্ব্বীরন্ স্ত্রীণামাজীবনক্ষয়াদিতি নারদবচনঞ্চ। যত্তু পারতন্ত্র্যবচনং ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতীত্যাদি তদস্তু পারতন্ত্র্যং ধনগ্রহণে তু কো বিরোধ ইতি মিতাক্ষরালিখনেন ধনগ্রহণেঽধিকারো বোধ্যতে ন তু দানবিক্রয়াদাবিতি। যত্তু গৃহীতধনায়াঃ পত্ন্যাস্তদ্ধনেন জীবনমাত্রং দানাধীকরণবিক্রয়েষু তু নাধিকার ইতি। মৃতে ভর্ত্তরি ভর্ত্রংশং লভেত কুলপালিকা। যাবজ্জীবং নহি স্বাম্যং দানাধমনবিক্রয়ে ইতি কাত্যায়নবচনাৎ প্রতীয়ত ইতি তদপি দৃষ্টার্থনটনর্ত্তকাদিদানাস্বাতন্ত্র্যপরং অদৃষ্টার্থদানে তদুপযোগিনো রাধীকরণবিক্রয়োশ্চ তেনৈবাধিকারাভিধানাদিতি বীরমিত্রোদয়লিখনমিতি মহাভারতে স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন। অপহারং ঐচ্ছিকদানবিক্রয়াদিকমিতি বিবাদচিন্তামণিলিখনঞ্চেতি।

দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরং।

প্রথমপ্রশ্নোত্তরলিখিতেদৃশস্ত্রীসংক্রান্তধনস্য স্ত্রীধনত্বাত্তয়োরন্যতরাধিকারিণ্যাঃ স্ত্রিয়া উপরমে ব্রাহ্মাদি-বিবাহেন পত্নীত্বং প্রাপ্তায়াস্তস্মিনে ভর্তৃসন্নিহিততরসপিণ্ডাভাবে ভর্তৃভগিনীপৌত্রত্বেন পতিপিতৃস্বস্রীয়পুত্রত্বেন বা ভর্তৃসন্নিহিতসপিণ্ডস্য প্রশ্নলিখিতদ্বিতীয়তৃতীয়ভ্রাতৃভগিনীপৌত্রস্যাধিকারঃ। আসুরাদিবিবাহেষু ভার্য্যাত্বং প্রাপ্তায়াস্তু যদ্যপি মাতৃপিতৃতৎসপিণ্ডানামধিকারস্তথাপ্যত্র তেষামভাবাৎ ভর্তৃসন্নিহিতসপিণ্ডস্য সপিণ্ডী-করণান্তশ্রাদ্ধকর্তুস্তস্যৈবাধিকার ইতি বারাণস্যাদিদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়নির্ণয়সিন্ধুপ্রভৃতিগ্রন্থ-সম্মতা ব্যবস্থা।

অত্র প্রমাণং।

আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতমিতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাখ্যায়াং আদ্যশব্দেন রিকৃথক্রয়সংবিভাগ-পরিগ্রহাধিগমপ্রাপ্তমেতৎ স্ত্রীধনং মন্বাদিভিরুক্তং। স্ত্রীধনশব্দশ্চ যৌগিকো ন পারিভাষিকঃ যোগসম্ভবে পরিভাষায়া অযুক্তত্বাদিতি মিতাক্ষরালিখনেন সংবিভাগপদবাচ্যসংক্রান্তধনস্যাপি স্ত্রীধনত্বমুপপাদ্য অপ্রজঃ স্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষপীতি যোগীশ্বরবচনবিবরণে অপ্রজসঃ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ ব্রাহ্মদৈবার্ষপ্রাজাপত্যেষু চতুর্ষু বিবাহেষু ভার্য্যাত্বং প্রাপ্তায়া অতীতায়াঃ পূর্ব্বোক্তং ধনং প্রথমং ভর্ত্তুর্ভবতি তদভাবে তৎপ্রত্যাসন্নানাং সপিণ্ডানাং ভবতি শেষেষু আসুরগান্ধর্ব্বরাক্ষসপৈশাচেষু তদপ্রজঃ স্ত্রীধনং পিতৃগামীতি মিতাক্ষরালিখনং। সপিণ্ডতা চৈকশরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি। তথাহি পুত্রস্য পিতৃশরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রা সহৈকপিণ্ডতা এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ তচ্ছরীরাবয়বান্বয়াৎ। এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা তথা মাতামহাদিভিরপি মাতৃদ্বারেণ ইত্যাদ্যাচারাধ্যায়ে মিতাক্ষরালিখনেন মাতাপিতৃদ্বারেণ একশরীরাবয়বান্বয়ো ভগিনীপৌত্রেণ পিতৃস্বস্রীয়পুত্রেণ বা সহাস্তীতি। সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে ইতি মিতাক্ষরাধৃতবৃহন্মনুবচনেন তস্যাপি সপ্তমান্তর্গতত্বাৎ সপিণ্ডত্বসিদ্ধিরিতি। পিতামহ্যাশ্চাভাবে সমানগোত্রজাঃ সপিণ্ডাঃ পিতামহাদয়ো ধনভাজঃ ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানাং বন্ধুশব্দেনোপাত্তত্বাদিতি মিতাক্ষরালিখনে ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানামিতি সামান্যনির্দ্দেশাৎ বন্ধুপদস্যোপলক্ষণতয়া সর্ব্বেষাং ভিন্নগোত্রসপিণ্ডানাং গ্রহণমবশ্যং বক্তব্যং বক্ষ্যমাণ-মাতৃস্বস্রীয়াদিমাত্রপরত্বে তদেব নির্দ্দিশেৎ ব্যবহিতসপিণ্ডমাতামহীভগিনীপুত্রাণামধিকারঃ সন্নিহিততরস্ব-ভাগিনেয়স্য চানধিকার আপদ্যেত অতএব সঞ্চয়সমুত্থানে বিজ্ঞানেশ্বরেণৈব 'দেশান্তরে গতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাখ্যানে বান্ধবা মাতৃপক্ষীয়া মাতুলাদ্যা ইত্যনেন ভিন্নগোত্রসপিণ্ডানাং মাতুলাদীনামধিকারঃ স্বহস্তিতঃ। ন চ সঞ্চয়সমুত্থান এব বান্ধবপদবাচ্যমাতুলাদীনামধিকারো বাচনিক ইতি বাচ্যং। পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মশ্চ পত্নীদুহিতর ইত্যাদিপ্রতিপাদিত এবাত্রাপি জ্ঞেয়ঃ। শিষ্যসব্রহ্মচারিব্রাহ্মণনিষেধো বাণকৃপ্রাপ্তিশ্চ বচনপ্রয়োজনং ইতি তত্রত্যলিখনাসঙ্গতেরিতি যোগীশ্বরবচনেঽপি বন্ধুপদেন মাতুলাদ্যুপলক্ষণ-মন্যথা মাতুলাদীনামগ্রহণমেব প্রসজ্যেতেতি তৎপুত্রাণাং ধনাধিকারস্তত্তঃ প্রত্যাসন্নানাং তেষামেব স নেতি মহদনৌচিত্যমাপদ্যেত। ইতি বীরমিত্রোদয়ঃ স্নুষা স্বস্রীয়তৎপুত্রা জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ। পুত্রাভাবে তু কুর্ব্বীরন্ সপিণ্ডাস্তং যথাবিধি ইতি নির্ণয়সিন্ধুধৃতবৃহদ্যমবচনং। পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ। সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়াহো নৃপ জায়তে ইতি চ তদ্ধৃতবিষ্ণুপুরাণবচনং উপকারকত্বেন ধনসম্বন্ধস্ত পুত্রাদীনাং ত্রয়াণাং পিত্রাদিত্রিকমহোপকারকারিত্বাৎ পুত্রাদিভির্গৃহীতং ধনং স্বামিন এবোপকারকং উপকারপ্রত্যাসত্ত্যা তদীয়মেবোপকারপ্রত্যাসত্তিশ্চাভ্যর্হিতা ইত্যাদি বীরমিত্রোদয়ে প্রসিদ্ধতর ইত্যলং প্রপঞ্চেন।

বিদ্যামন্দিরস্থপণ্ডিতানাং সম্মতেয়ং ব্যবস্থা

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকশ্রীরামচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীহরনাথশর্ম্মণাং শ্রীগঙ্গাধরশর্ম্মণাং শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীনিমাইচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণাং শ্রীহরি-প্রসাদশর্ম্মণাং শ্রীযোগধ্যানশর্ম্মণাং।

[এই ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছাড়া আরও দুই জন পণ্ডিতের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের এক জন ঈশ্বর দত্ত পাণ্ডে; অপর জন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত হীরানন্দ মিশ্র। বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী, এই সকল পণ্ডিত পুনরায় সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন—২৭ জুলাই ১৮৪০ তারিখে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করেন।]

মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বন্দনা অংশে মাণিক দত্ত নামক এক ব্যক্তির প্রতি বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, মাণিক দত্তের নিকট হইতে তিনি "গীত-পথের পরিচয়" লাভ করেন।[১] মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে মাণিক দত্ত-রচিত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পুথি সংগৃহীত আছে। উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই পুথির একটি পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।[২] কিন্তু তন্মধ্যে মাণিক দত্তের সহিত মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর পরিচয় বা সাক্ষাৎকার সূচক কোন কথা পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংপ্রতি মাণিক দত্ত-কৃত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের খণ্ডিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।[৩] ইহার মধ্যে এমন একটি অংশ পাওয়া যাইতেছে, যাহা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আলোচ্য মাণিক দত্তের প্রতিই মুকুন্দরাম বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এমন কি, হয়ত বা মাণিক দত্ত-রচিত চণ্ডীমঙ্গল দেখিয়া ও পাঠ করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি যথার্থ হইলে বলিতে হয় যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দের পূর্ব্বে চণ্ডীর গান রচনা করেন এবং তাহা দেখিয়া মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি লাভ করেন বলিয়া মাণিক দত্তের প্রতি তাঁহার বিনয় প্রকাশ স্বাভাবিক। উক্ত অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গীতের পুথি নিল দুর্গা বগলে দাবিআ।
মাণিক দত্তের শিয়রে দুর্গা বসিল চাপিআ।

মাণিক দত্তের শিয়রে মারে নাথিকের ঘা।
তার কালা ছানি দূরে গেল দিব্য হৈল গা।
চিআও বাছা মাণিক দত্ত গায়ে কর বল।
তোর ঘরে আইলাঙ দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল।
হের দেখ গীতের পুথি দিলাঙ তোমার তরে।
তুমি জাঞা গান কর কলিঙ্গ নগরে।

জেথানে জাইআ ঘট করিবে স্থাপন।
সেই ঘটে আমি থাকিব সর্ব্বক্ষণ।
রজনী প্রভাতে দত্ত·· গ্য পাইল।
ভবানীর মঙ্গল পোথা পড়িতে লাগিল।
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত ভাবিল বিশেষে।
কেমতে গাইব এত গীত অষ্ট দিবসে।
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত অন্তরে ডরিল।
তিন শত বত্তিশ লাচাড়ি ভাবিআ রচিল।
তিন শত বত্তিশ ল্যাচাড়ি কবিলেন গান।

দিশা পাঁচালি কৈল পদ মুর্ত্তিমান।
রঘু রাঘব আর মুকুন্দ ব্রাহ্মণ।

মাণিক দত্তের সঙ্গে হইল দরশন।
মাণিক দত্ত কহিল পুথির বিবরণ।
শুনিঞা চমৎকার হইল তিন জন।
রঘুয়ে রচিআ পুথি অদভূত করিল।
রাঘবে রচিআ পুথি বিদেশ করিল।
মুকুন্দে রচিআ পুথি কবিকঙ্কণ কৈল।

আপনি মাণিক দত্ত মাণিকদত্তি কৈল।
মধ্যে চারি পদে দুর্গার গান হইল।
সংপ্রদা কারণে দত্ত ভাবিতে লাগিল।
সংপ্রদা করিল দত্ত আপনার মনে।
প্রথমে আরম্ভ গীত কলিঙ্গ ভুবনে।
কার না লয় অর্থ বিত্ত কার না লয় ধন।
ঘরে ঘরে পূজিছে মঙ্গলচণ্ডী গান। ইত্যাদি

—২২ পত্র।

---

১ মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬ পৃঃ।

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৪৭ পৃঃ।

৩ দিনাজপুর, বালুরঘাটনিবাসী স্কুল সাব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বনমালী ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানা যায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানার প্রবর্ত্তন করেন পোর্ত্তুগীসেরা। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ-ভারতের গোয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা ইউরোপ হইতে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া সেখানে স্থাপন করেন। ইহারই একটিতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক একটি গ্রন্থ পোর্ত্তুগীস ভাষায় রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

ভারতীয় ভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে কোচীনে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ গোন্‌সালভেস্ নামক এক জন স্পেনদেশীয় পাদ্‌রি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-প্রণীত 'ক্রিশ্চিয়ান ডক্‌ট্রিন' নামক পুস্তকের অনুবাদ 'ক্রীষ্ট্য বয়কনম্' মুদ্রিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ছাপা বই। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা 'দি নিউ রিভিউ' পত্রিকায় লিও প্রসারপিও-লিখিত "The First Printing Presses in India" প্রবন্ধে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের বিশদ ইতিহাস দেওয়া আছে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বাংলা দেশের হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই বৎসর হইতে বাংলা অক্ষরে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মুদ্রিত প্রমাণ বর্ত্তমান; কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তিগত পুথি, নথি ও দলিলের উপর আমাদের নির্ভর নয়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত চারিটি (কাহারও কাহারও মতে পাঁচটি) গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে বর্ত্তমান থাকার প্রসিদ্ধি থাকিলেও আমরা এখন পর্য্যন্ত একটি ধর্ম্মগ্রন্থ ও একটি সম্মিলিত ব্যাকরণ-অভিধানেরই সন্ধান পাইয়াছি। এই দুইটিও একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত—সমগ্র বাংলা দেশের লিখিত ভাষার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অল্প। সুতরাং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাংলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব। এই বৎসরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তক ছাপা হয় এবং ইংরেজীতে লিখিত এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে অংশ-বিশেষ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক ও ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে

কিছু বলিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চায় ইংরেজ

মুর্শিদাবাদ জিলায় কাশিমবাজারের কুঠীতে জে. মার্শাল (J Marshall) নামক এক জন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।* পরবর্ত্তী প্রায় শতাব্দীকাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরেই গবর্মেণ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে (No. 355—Consultations, July 3) দেখা যায় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার দরুন কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে (Mr. Bristow) অপসারিত করা হইয়াছিল।† সুতরাং বুঝা যাইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কর্ম্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতেই শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র লটকাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

> Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your affairs by his thorough knowledge of the language and people of this country

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, জোন্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত-জনোচিত উৎসাহ ও কৌতূহল লইয়া গবেষণা সুরু করেন। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ইহাদের অগ্রণী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম এলাকা হইতে গ্ল্যাডউইন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের কিছু উপকরণ আছে। গ্ল্যাডউইন তৎপূর্ব্বেই *A Compendious Vocabulary, English and Persian, Compiled for the East India Company* নামক শব্দসংগ্রহ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্ল্যাডউইন লিখিয়াছিলেন,

> ...I have placed the Languages in the Order you see them, Gentlemen, to shew in what Manner the Arabic is incorporated with the Persic, and to exhibit how the Persic is inflicted in the Hindouse, as well as to endeavour to discover some Traces of the Shanskerit Language in the Bengal Dialect. .. . .

---

* "He made a translation of the *Sanskrit Book entitled Serebaugabut Pooran* in the English language which was transmitted to England and was deposited in the British Museum." (B. M. Harl. MS. 4253-55).—*The Calcutta Review*, No. CCLXX, p 397.

† *Selections from Unpublished Records of Government*, Vol. I, p. 146.

গ্র্যাডউইনের শব্দকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এই সর্ব্বপ্রথম এক জন ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার হিন্দু আইনের বিখ্যাত অনুবাদ-পুস্তক *A Code of Gentoo Laws* লণ্ডন হইতে ঐ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে শব্দসংগ্রহের তালিকায় অনেকগুলি বাংলা শব্দ স্থান পাইয়াছে, বেনা, বেত, বহেড়া, ব্যাপারী, ভেড়ুয়া, ভাণ্ডারা, বাঁধ, কাহন, চণ্ডাল, চৈত, চৌকী, কুলী, কোল, পছাড়ি, ডাল, ঘি, ঘড়ি, গোমস্তা, গণ্ডা, হাট, হরকরা, হাওলা, কাঁসা, নালা, পান, পিপুল, ফটিক, পেয়াদা, পুঁথি, সাধ, শাক, ঠাকুর, তরকারী, টুকরি, তোলা, উকীল প্রভৃতি শব্দ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ছাপার হরফ

A Code of Gentoo Laws পুস্তকে যাহার সূত্রপাত, *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য হালহেড সাহেব উক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংলা হরফ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন পর্য্যন্ত বাংলা হরফ প্রস্তুতের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বোল্টস নামক কোম্পানীর এক জন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী লণ্ডনে বসিয়া একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সুবিখ্যাত অনুবাদক) চার্লস উইলকিন্সকে স্মরণ করিলেন। হেষ্টিংস জানিতেন উইলকিন্স একবার নিতান্ত অবসরবিনোদনের জন্য ছেনি কাটিয়া দুই একটি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বন্ধু হালহেডের পুস্তক-মুদ্রণে সহায়তা করিবার জন্য উইলকিন্স উৎসাহিত হইয়া কাজে লাগিলেন। হালহেড ও উইলকিন্স উভয়েই তখন হুগলীর কুঠীতে কর্ম্মচারী। উইলকিন্স হরফ-প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক স্থানীয় এক জন কামারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ হইয়াছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাঁহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে অক্ষর প্রচলিত আছে তাহা পঞ্চানন ও মনোহর নির্ম্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা" প্রবন্ধ পড়িতে বলি।

বাংলা ছাপার হরফ সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেদিন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক দল পণ্ডিত একটা মোটা ভুল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ

অমূলক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, সেকালে বাংলা ভাষার একটি পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *A Grammar of the Bengal Language* হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় বাংলা অক্ষর সম্বলিত পুস্তক ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্যে ঢালাই-করা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাটা হরফগুলি সমান ও সুদৃশ্য না হওয়াতেই ঐরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আজও পর্য্যন্ত গল্পপ্রবণ গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত হয়। আমাদের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে মিলিবে :—

১। *A Grammar of the Bengal Language*—N B Halhed, 1778, Preface pp xxii—xxiv.

২। *The Friend of India*, July 1818, pp 61-62, 64, "Progress of Indian Literature"

৩। *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* by John Clark Marshman, 1859, Vol I, p 70, "First Printing in Bengalee."

উইলকিন্স-কৃত হরফে হালহেডের ব্যাকরণ হুগলির যে ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল সেই ছাপাখানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। নিম্নলিখিত দরখাস্তটি হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউনসিল কলিকাতাতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

To J P Auriol, Esq, Secretary to the General Department

Sir, The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing Office under the Superintendence of Mr Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed Copy of the Rates of Printing and to desire that you will prepare and furnish Mr Wilkins with Copies of all such papers in your office as will admit of being printed, whether in the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks for Names, Dates and other occurrences as are liable to alter, and specifying the Number of each Form usually issued in the course of a year.

Revenue Department, I am, Sir,
Fort William, *the 8th January 1779* Your most obedient Servant,

(Sd) Geo Hodgson,
Secretary.

Copy
Rates of Printing
For English Impressions

For every Quire of Folio Post, Paper included
If Printed on One Side Sa Rs 3
If Printed on both sides „ 5

For Persian and Bengali

For every Quire of Folio Post Printed on one side „ 5
Do Do „ 7

Revenue Dept (Sd) W. Webber,
A true copy *Sub-Secretary.*

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাঁহার 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। গবর্মেণ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানায় হইত।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা গদ্য

সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা-গদ্যের যে নমুনাটুকু ইতিপূর্ব্বে (জগতধির রায়ের দরখাস্ত) উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাংলা-গদ্যের তৎকালীন প্রকৃতি ধরা পড়িবে, সেই গদ্যই কি ভাবে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিল, তাহার ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহা বাংলা দেশে মুসলমান-প্রভাবের ফল। ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের বৈদেশিক শাসন নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই চাপে বাংলা ভাষার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিও অব্যাহত থাকে নাই। কবিতায় ইহা তেমন প্রকট হয় নাই। একমাত্র ভারতচন্দ্র 'যাবনীমিশাল' ভাষা ইচ্ছা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এমন কি, মুসলমান কবি আলাওলের ভাষাও সংস্কৃত-ঘেঁষা। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগ, সুতরাং আরবী ও পারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত সুস্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া "গরিবনেওাজ শেলামত" বলিয়া সুরু করিয়া "ফিদবি" বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।

সংস্কৃতীকরণ

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্ত্তী কালে হেনুরি পিট্স ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্ত্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্ত্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা-

গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাক্‌স্‌টন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবদ্গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে* মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলার শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে লিখিত হালহেড সাহেবের মন্তব্যপাঠে এই সকল বৈদেশিক পণ্ডিতের মনোভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity, when it could borrow Shanscrit terms for every circumstance without the danger of becoming unintelligble, and when tyranny had not yet attempted to impose its fetters on the freedom of composition ... how far the Modern Bengalese have been forced to debase the purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers [who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present This practice familiarised to their ears such of the Persian terms as more immediately concerned their several affairs, and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and terminations †

অর্থাৎ, বাংলা-গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিত বলিয়াই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে পারসী-ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষে বহু পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হালহেড তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে, খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাংলা দেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক্ হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলা দেশ পীড়িত হইয়াছে সেগুলি দেশের ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক্ রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ পর-পর সকলেই ধর্ম্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।‡

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার তাঁহার সুবিখ্যাত ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

it [তাঁহার শব্দসংগ্রহ] will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied

* N B Halhed প্রণীত *A Code of Gentoo Laws* (১৭৭৬ খ্রী:) ও হটন সাহেবের বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (লণ্ডন ১৮৩৩) ভূমিকায় স্যর চার্লস উইলকিন্সের শব্দসংগ্রহের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

† N. B Halhed *A Grammar of the Bengal Language*, pp. 207-8.

‡ Halhed *A Grammar of the Bengal Language*, pp. xx-xxi.

to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms.—which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, while I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bongalee terms, whose places they had usurped. —Introduction, i

Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bongalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue—*Ibid*, ii.

It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language, and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties—*Ibid*, iv

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ত ফরষ্টার সাহেব আদালতের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাষা-বিভ্রাট প্রকট করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন সর্ব্বনিম্ন ডোম-শ্রেণীর এক জন ফরিয়াদী প্রথমতঃ থানার দারোগার নিকট কাহারও বিরুদ্ধে সামান্ত নালিশ জানাইল। পারসী ভাষায় তোতাকাহিনী পর্য্যন্ত দারোগা সাহেবের বিদ্যা। ডোমের আরজি দারোগা সাহেব পারসী অথবা বাংলাতে লিখিয়া লইলেন, যদি পারসীতে লেখেন তাহা হইলে এই পারসীবিশারদ পারসী হরফে কুৎসিত বাংলা লিখিবেন, মধ্যে মধ্যে পারসী বাক্যবিন্যাস থাকিবে; আর যদি বাংলায় লেখেন তাহা হইলে ফরিয়াদীর নালিশ তিনি এই শ্রেণীর পারসীতেই অনুবাদ করিয়া লইবেন!—সাক্ষীদের বক্তব্যও এই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে লিখিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইল, সেখানেও আর এক দফা পারসীতে বাংলাতে তালগোল পাকাইল এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজামৎ আদালতের নিকট ঘটনার বিবরণ বিচারার্থ প্রেরিত হইল। সেখানে এই অদ্ভুত বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ যাহা দাঁড়াইল তাহাতে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস, দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসি পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

উইলিয়ম কেরীরও বিশ্বাস ছিল—

The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.

এই আন্দোলনের ফলে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাংলা ভাষা যে রূপ লইয়াছিল W. S. Seton-Karr সে সম্বন্ধে ঐ সালে লিখিয়াছিলেন—

Closely dependant on the parent Sanskrit, it possesses many of the advantages, and few of the blemishes, which characterize that first of Indo-Germanic tongues. Though not without a few dialectical variations, it preserves mainly an unbroken regularity, from the banks of the Subhamika [সুবর্ণরেখা], to the frontiers of Assam. It is simple in its structure, lucid in its syntax, and vigorous in its expressions, and above all, it is in-

separably connected in our mind with those pleasing recollections, which the progress of education, and the first dawning of enlightened opinions in the Lower Provinces, cannot fail to excite···It has frequently been remarked that Bengali more closely resembles Sanskrit than Italian does Latin. We might go further, and almost say that it has altered very little more from the original, than modern Greek has from the language of Thucydides and *Plato* Bengali has experienced but a moderate change from the vicissitudes of conquest, and the successive sway of Mussulman or Affghan dynasties. It is true that the influx of Persian and Arabic substantives, into the spoken and even the written dialect, has been very considerable but the great landmarks of the language have remained fixed and unalterable.

এরূপ বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা-অবস্থা হইতে তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী; অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে এক জন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনিও ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, ইঁহাদের উৎসাহ ও অন্নে প্রতিপালিত, স্বাধীনভাবে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোনও কীর্ত্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু। জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী প্রবর্তিত শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্পর্কে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদিগকে জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোনও মৌলিক রচনা এই কালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি একথা আমাদের আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লিখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্ব্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

১৭৭৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা মাত্র ছয় জন বৈদেশিক কর্ম্মীর নাম পাইতেছি; ইঁহাদের কীর্ত্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্য্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত; আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা বাঙালীর দ্বারা এই দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ-অভিধানের খোন্তা-কোদাল

চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয় জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।

প্রথম—ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* রচনা করিয়া চার্লস উইলকিন্স-নির্ম্মিত সীসার বাংলা হরফ ব্যবহার করিয়া তাহা মুদ্রিত করেন। মুদ্রণস্থল হুগলী।

দ্বিতীয়—জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে *Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewannee Adaulut* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

তৃতীয়—এন. বি. এডমনষ্টোন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice, in the Fouzdarry, or Criminal Courts; in Bengal, Behar and Orissa* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press

ইনি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates Passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792* [with some snpplementary enactments] অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

চতুর্থ—হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত" করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা।

এই হেন্‌রি ফরষ্টারই ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সুবিখ্যাত *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee, and vice versa* পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস।

পঞ্চম—এ. আপজন্, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, দি ক্রনিকল প্রেস।

এবং ষষ্ঠ—জন্ মিলার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Tutor* বা 'শিক্ষা গুরু' পুস্তক প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল অনির্দ্দিষ্ট, সম্ভবতঃ কলিকাতা।

বাংলা-গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয় জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষা ও তাহার উন্নতিসাধনে হালহেড ও

ফরষ্টারের দান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ এইচ. টি. কোলব্রুক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Gaura, or, as it is commonly called, *Bengalah* or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of *Gaur* was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts ; but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only ; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from *Sanscrit.* This dialect has not been neglected by learned men. Many *Sanscrit* poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned *Hindus* in Bengal speak it almost exclusively . verbal instruction in sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect Instead of writing it in the *Devanagari*, as the *Pracrit* and *Hinderi* are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but *Deva-nagari* difformed for the sake of expeditious writing Even the learned amongst them employ this character for the *Sanscrit* language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge of the *Bengali* dialect accessible , and Mr. Forster's further exertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India. —Vol. VII, pp. 223-4.

হালহেড ও তাঁহার ব্যাকরণ, ফরষ্টার ও তাঁহার অভিধান সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। আপজনের অভিধান সম্পর্কে আমি ৪৩শ ভাগ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে এগুলির বিস্তৃততর পরিচয় অনাবশ্যক।

জোনাথান ডানকান

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জোনাথান ডানকান সাহেবের আইন-বহির অনুবাদটি বাংলা ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৫+৩১। যে-সকল আইন নন্দকুমার-মামলার বিচারপতি বিখ্যাত স্যর ইলাইজা ইম্পে কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই গ্রন্থ তাহারই অনুবাদ। এদেশের কুত্রাপি এই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই ; লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড আছে।

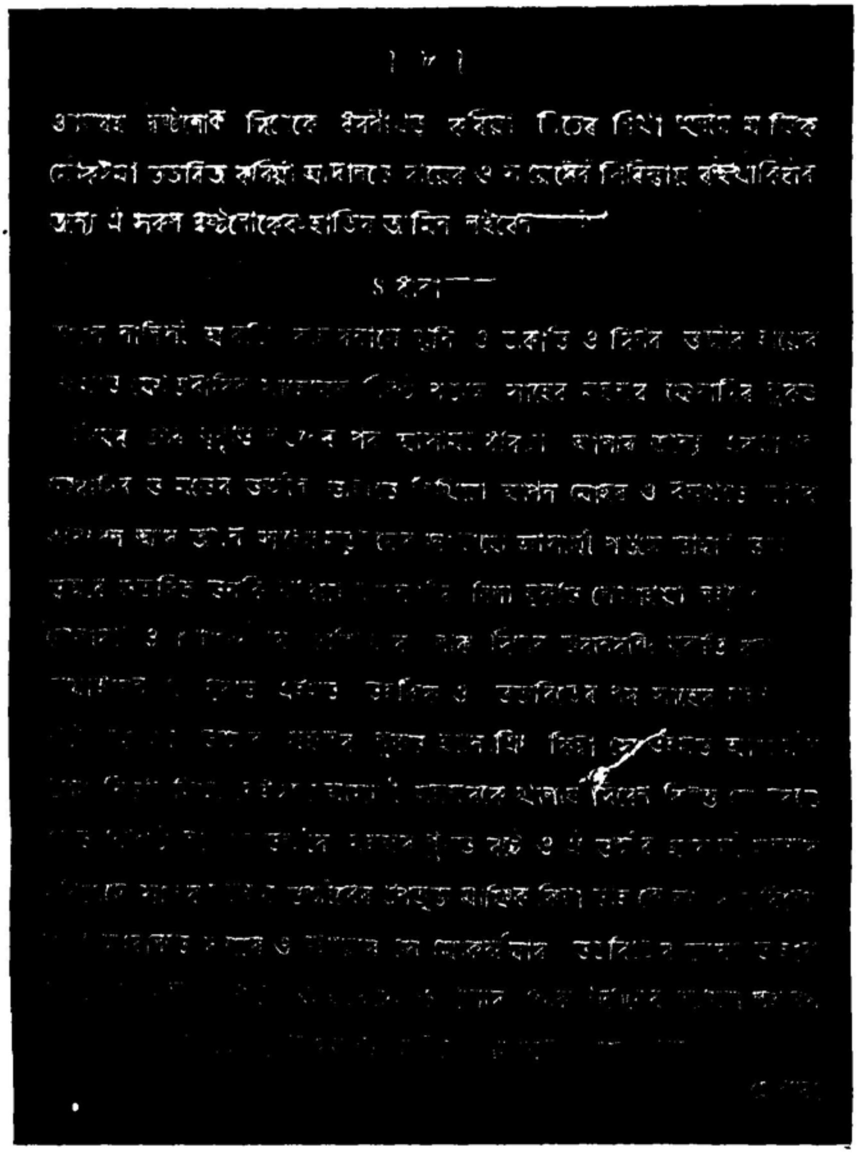
জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ান রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তৎকালীন বাংলা ভাষায় ইহার অসাধারণ দখল দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ইহাকে 'ইম্পে কোড' অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৮ সালে ইনি

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গালা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওআনি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত স্থাপিলের কিতহবি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৩ সন লাগাএদ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌন্সলি সাহেব লোক অনবকাস জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্টোবর মাসের ২৪ বাঙ্গালা সন ১১৮৭। ১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে

একজন

জোনাথান ডানকান্‌-অনূদিত ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulut* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা



এন. বি এডমনষ্টোন-অনূদিত ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts in Bengal, Behar and Orissa* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

বারাণসীর রেসিডেণ্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট হইয়া যান। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ ও মারাঠা-যুদ্ধ তাঁহার সময়েই সংঘটিত হয়।

জোনাথান ডানকানের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি—

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম—

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোক অনবকাশ জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন ১১৮৭।১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে এক জন হাকিম তাঁহারদিগের অভিপ্রায় মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেণ সংপতি তাহা অন্যথা হইয়া এই স্থির হইল যে সাহেবেরা আপনা হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেণ তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেণ আর মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জিলাসকল বিস্তীর্ণ জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত ইহা জানিয়া ও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় একারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ত্রি আপরিল বাঙ্গলা ১১৮৭ সনের ২৭ চৈত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েক স্থানে নূতন দেওয়ানি আদালতের কচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুর ও চাতরা ও লোয়া ও দরভাঙ্গা ও ভাগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাকরগঞ্জ ও ইসলামাবাদ ও মুড়ঙ্গিতে নিরূপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে লোকের আয়াস ও ব্যামোহ না হয় এ জন্যে পুরনিয়ার আদালত তাজপুরে নিরূপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়ার আদালত মিছুইতে ও রঘুনাথপুরের আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত সুলতানপুইতে স্থৈর্য্য হইল আর ইহার পূর্ব্বে কোন ২ সময় কোন ২ কার্য্যের নিমিত্তে মপস্বলের সকল আদালত ও সদর আদালতের বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা এমত আছে০ যে নূতন আদালত সকলের কার্য্যে আইসে না··

১৭৭৮ সনে মুদ্রিত যে পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থের ভাষা তাহা অপেক্ষা কতখানি সংস্কৃত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এন. বি. এডমনষ্টোন

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোনও সিবিলিয়ান ছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য স্যর আর্চিবল্ড এডমনষ্টোনের এই পুত্র ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিবিলিয়ান

হইয়া কলিকাতায় আসেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, সেক্রেটারিয়েট হইতে তিনি গবর্মেণ্টের পার্সী-অনুবাদক পদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গবর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। তিনি ১৮১২ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এডমনষ্টোনের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও পার্সীঘেঁষা। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঙ্গ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—

[অন্যত্র]—সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কত্তর্ব্ব কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জখন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টারের জীবনী অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।* তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছিল। সি ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal'.

তাঁহার বিখ্যাত কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদের একটু পরিচয় দিতেছি—

হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষত্তো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তলুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেণ কিন্ত এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোনো প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভুম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্ত্য ও ওজর হইবেক না।

জন্ মিলার

এখন পর্য্যন্ত মিলারের নাম বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে লঙের ক্যাটালগে, 'বিশ্বকোষে' ও ডক্টর সুশীলকুমার দের *History of Bengali Literature* পুস্তকে উল্লিখিত

---

* S. K. De *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, pp. 89-92.

দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অভিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন যে পুস্তকখানিকে মিলারের অভিধান বলিয়া সুশীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে আপ্‌জনের 'বোকেবুলরি' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এত দিন মিলারের নামটাই ছিল—তাঁহার কীর্ত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রামকমল সেনের *A Dictionary in English and Bengalee* (1834) পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে—

> In 1801 a *Mr. Miller* compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories not equal however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued from the press —Pp. 17-18.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ সম্ভবতঃ রামকমলের এই বিবৃতিটুকু ভাল করিয়া দেখেন নাই, দেখিলে মিলারের ওয়ার্ডবুকটি 'অভিধান'-খ্যাতি লাভ করিত না। আমরা সম্প্রতি এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি ও পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। জন মিলারের গ্রন্থের নাম—

> The Tutor or a New English and B[illegible]e Work, well adapted to teach the Natives English in three parts
>
> শিক্ষ্যাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরাজি সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে Compiled Translated and Printed By John Miller 1797.

যে ক্যাটালগে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখি তাহাতে ইহা 'শ্রীরামপুরে' মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ আছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬+১৬৪। কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেখানে উইলিয়ম কেরীর যত্নে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতায় কোনও ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

জন মিলারের কোনও পরিচয় সংগ্রহ করা দুরূহ। সেই সময় একাধিক 'জন মিলার' কোম্পানীর রাইটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন; অন্য কোনও জন মিলারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পুস্তকের ভূমিকার ভাষা এত অদ্ভুত যে তাহা পড়িলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন্ মিলার বাংলা ভাষা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ছিলেন। ভূমিকাটি অংশতঃ এইরূপ—

বাঙ্গালিদিগেরকে

আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোনো কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ করো জে এ তোমাদিগের সাহবের ছারায় মঞ্জুর হয়।

আমার মনস্ত ছিলো স'পরোধ করিতে এই কেতাব সমস্ততে। কিন্তু আমি এক্ষেনে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার ছারায়।

বাংলা-গদ্যের সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ হিসাবে এই পুস্তক ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান্। প্লেটে মুদ্রিত সূচীপত্র হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাইবে। মিলার সাহেব ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদের যে সহজ পদ্ধতি সেই যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাহা কিছুকাল অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া ফিরিঙ্গি বাংলার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ইহার পরেই আমরা শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্কের কথা বলিব।

৭ শ্রী শ্রী রাম —

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও হুজুরি তালুকদারান আর [illegible] জমিনের মালিক সদরে মালগুজারি করে তাহার দিগের এস্তেহার দেওয়া জাইতেছে —

প্রথম —

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সদর খাজানার দষ সালা বন্দবস্তের জে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বরের ১৮ তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহেজ্জ সন ১২০৩ হিজরি মুতাবেক ৫ মাহ আশ্বিন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ নবম্বরের ২৫ তারিখে মুতাবেক ৭ রবিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবিক ১০ মাহ অগ্রহায়ন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৯০ সালের মাহ ফেবরোরের ১০ তারিখে মুতাবিক ২৪ মাহ জমাদিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেকে ১ মাহ ফাল্গুন সন ১১৯৬ বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকের দিগে খবর দেয়া গিয়াছে জাহারা সরকারের সহিত বন্দবস্ত করিবেন তাহা দিগের জমির জমা ঐ আইন মাফিক জে ধার্য্য হবেক তাহা দষ বৎসারের পরেও বরকরার ওহামেসা কায়েম থাকিবেক জদ্যপী শ্রীযুৎ ইংরেজ কম্পানির তরফ বিলাতের কার্য্যের মুক্তিয়ার কারেরা মঞ্জুর করেন নতুবা কায়েম থাকিবেক না

দ্বিতিয দফা —

[illegible] সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও হুজুরি তালুকদারান ও আর জে কেহ জমিনের মালিক সদরে মালগুজারি করে তাহার দিগেরে [illegible] দরবার গবনর জেনরেল বাহাদুর খবর দিতেছেন জে [illegible]

এইচ. পি. ফরষ্টার-অনূদিত ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'কর্ণওয়ালিস কোড' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

ক

কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind
কাটাইতে	to cauſe to cut
কাটাৰ	a poignard, dagger
কাটাৰি	a crooked broad kniſe
কাটিতে	to cut, to hew
কাটিতে আঁখর	to blot a letter
কাটনাকাটিতে	to ſpin
কাটৰা	a fence of boards
কাঠুর‍্যা	a wood-cleaver
কাঁটা	a thorn, a fork, a fiſh-bone
কাঠ	wood
কাঠ বেৰাল	a ſquirrel
কাঠেৰ	wooden, of wood
কাঠখড়	fire-wood
কাঠেৰ মাড়	a float of timber
কাঠা	a meaſure, a cotta or piece of ground [4 ells ſquare
কাড়াকাড়ি	force, violence
কাড়িয়া আনিতে	to get by force

১৭৯৩ সনে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত সর্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (আপজন্) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH

IN THREE PARTS

সিক্ষ্যা গুরু

কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালাবহি

ভালোওপহক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইং[illegible]

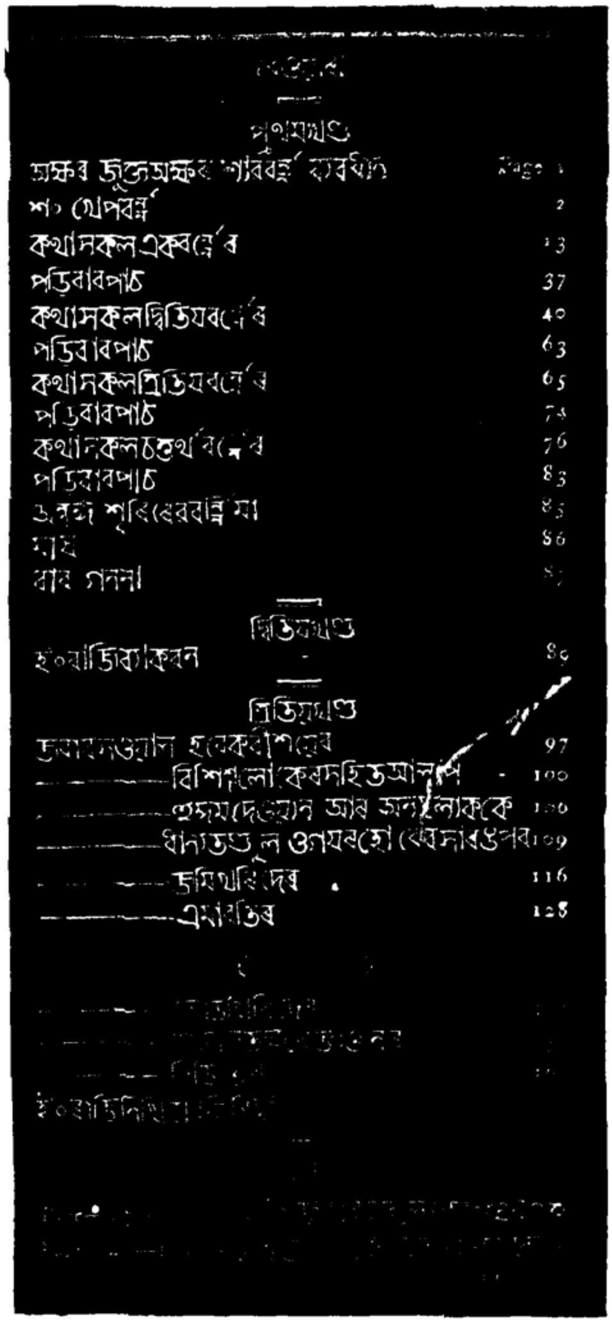
সিক্ষাকরাইতে তিনখণ্ডে

COMPILED, TRANSLATED [illegible]

By JOHN MILLER

1797.

জন্ মিলার-লিখিত ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের আখ্যাপত্র



'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১৩৪৫

বাংলা 'ভাষাপরিচয়ে'র ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহু লক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে' সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি-মুহূর্তের বোঝা পড়া, আলাপ পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ ক'রে চ'ললে কালের কোন্ দুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর এক যুগের বাতির মুখে জ্ব'লতে জ্ব'লতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদি যাত্রীরা চ'লে এসেছে তারি প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চ'লে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হ'য়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রং মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজো আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল—শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, উড়িয়া, গৌড়ী, বাংলা। আসামীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই ব'ললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্ন্‌লে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে

পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষা প্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশে অধিকার করেছিল। হর্ন্‌লের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষার মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতি দূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝ'রে ঝ'রে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌছয় তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় ব'য়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলা-দেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হ'ল না তার প্রকাশ লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতি পুরাতন এবং এই অতি আধুনিক বাক্যস্রোত এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হ'য়ে আছি। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধ'রে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার কৈফিয়ৎ সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চ'লতে চ'লতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব ব'লেই লেখবার ইচ্ছে হ'ল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও ক'রে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো চারটে খুঁত বেরবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ক'রে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিয়ে তা উদ্ধৃত ক'রে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার এ বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয় রূপের পরিচয় নিয়ে।—

> আমার পক্ষে যা সব চেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাস করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শারীর বিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে—মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটাবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি—প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি—ভয় আছে পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা "হায় কুষ্টি," "হায় কুষ্টি" ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী

শরীর তত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল ক'রেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তাহলেই ধন্য হব। ইতি ১৩।১১।৩৮

ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই,—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের এমন কি তার প্রেতলোকের হাট হদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চ'লতে চ'লতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে এসেছে আমি লিখেছি। তাতে ক'রে পাঠকেরাও সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘ'টে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হ'তে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা পাঠকদের মনে যদি জাগাতে পারি তাহ'লে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে ক'রে আশ্বস্ত হব।

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারি ব্যাখ্যা ক'রে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তারপরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি ব'লেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্য-ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আরএকজনের সকল বিষয়ে মিল এখনো পাকা হ'তে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলো-মেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হ'তে পারবে।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।—সম্পাদক।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ঋগ্বেদ এবং উহাতে বর্ণিত কৃষ্টির বয়স কত? ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে উহা এত পুরাতন যে কেহ বলিতে পারে না। উহা স্বতঃ উদ্ভূত। অন্যান্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের ন্যায় উহারও আদি নাই বলা যাইতে পারে। বেদ অর্থে জ্ঞান—ইহার সৃষ্টি বা আরম্ভের শক আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। প্রতিভাবান্ কবি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা স্তোত্র আকারে গান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্রষ্টা, তাঁহারা ঋষি নামে পরিচিত।

স্তোত্রগুলি ঋষিদের নানা বংশে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। কালে অনেক লোপ পাইয়াছিল। বায়ু এবং মৎস্য পুরাণের মতে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ন্যূন গণনায় খ্রিষ্টজন্মের সাড়ে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে তৎকালে প্রাপ্ত স্তোত্রগুলি প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল।

বেদের অতিপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই মত যে ভ্রান্ত নহে, তাহা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতে অনুমিত হয়। এইরূপ তথ্য আরও আছে।

(১) বেদচর্চা কখনও বন্ধ হয় নাই; তথাপি যে সকল দেবতার উপাসনা করা হইত, কালে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহারা খ্রিষ্টের বহু শতাব্দী পূর্বেই বিতর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বৈদিক নিঘণ্টুতে মেঘের মতন সামান্য ও সকলের পরিচিত বস্তুর ত্রিশটি নাম পাওয়া যায়। এত অধিক নামের হেতু কি? সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য নামটি, বৃত্র। অহি বা সর্পের নাম বৃত্র ঋগ্বেদেই আছে। কিন্তু মানুষের উদ্দাম কল্পনাতেও আকাশের মেঘকে কখনও দীর্ঘ সর্প মনে হয় না। ইন্দ্র প্রথমে জীবন্ত দেবতা ছিলেন, পরবর্তী কালে ঋগ্বেদে কেহ কেহ তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, ক্রমে তিনি অরূপ পরম দেবতা পরিগণিত হইলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, ঋগ্বেদ অল্পকালে গড়িয়া উঠে নাই, ইহার নির্মাণে বহুকাল লাগিয়াছিল। ভারতীয় ভাষ্যকার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় পুষ্ট ছিলেন, তথাপি তাঁহারা বেদের নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। এক এক দেবের বহুবিধ ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছিল। ইহার দুই কারণ ছিল। এক, বহু কালান্তরে বহু দেবের স্বরূপের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। দুই, বেদের কাল হইতে ভাষ্যকার বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

(২) ভাষাতত্ত্ব এবং অলৌকিকতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়াও পাশ্চাত্য বেদপাঠী পণ্ডিতগণের যত্নও বিফল হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতের আধুনিক ব্যাখ্যাতা প্রোফেসার

উইন্টারনিৎস্ তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (৭৬-৭৮ পৃঃ) স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কোনও অন্বেষকের নিকট ইন্দ্র ঝড়ের দেব, অন্যের নিকট পুরাতন সূর্যদেব। মরুদ্গণের জনক বলিয়া রুদ্রকে সাধারণতঃ ঝড়ের দেবতা বলা হয়, কিন্তু হিলেব্রাণ্টের মতে তিনি "গ্রীষ্মদেশের আবহের ভীমমূর্তির দেবতা।" কাহারও মতে অদিতি বিস্তীর্ণ আকাশ, কাহারও মতে অদিতি অনন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূমি। যাস্কের পূর্বে প্রাচীন ভারতের টীকাকারেরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে লইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ ভাবিতেন, তাঁহারা আকাশ ও ধরণী, কেহ বা দিবা ও রাত্রি। অদ্যাপি কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, তাঁহারা প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা। কাহারও মতে তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য। কেহ বা মনে করেন প্রভাতী ও সন্ধ্যাতারা, কেহ বা মিথুন নক্ষত্র।" এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে, অল্পদিন পূর্বেও পণ্ডিতেরা সোম বলিতে ঐ নামের বৃক্ষ বুঝিতেন, আকাশে সোম দেখিতে পান নাই, আর্যগণের মাস-গণনায় চন্দ্রও পান নাই। মিত্র ও বরুণ, সবিতা ও বিষ্ণু, এই সব প্রধান প্রধান দেব সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ নাই। কিন্তু যদি বেদের দেবতা অজ্ঞাত রহিয়া গেলেন, দুইটা শব্দের অর্থ জানিয়া বেদবিদ্যার্জনের সার্থকতা কি ?

(৩) বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আরও অনেক তথ্য ভাবিবার আছে। ঋগ্বেদে ইক্ষুর উল্লেখ আছে (৯।৮৬।১৮)। প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়, তখন উহার চাষ হইত। সম্ভবতঃ তখন শুধু চিবাইয়া রস পান করা হইত। ইক্ষুদণ্ড পেষণ করিয়া রস বাহির করিয়া শুখাইয়া পিণ্ড করিয়া মধুর পরিবর্তে ভোজনের কথা আর্যদের মনে হয় নাই। আমাদের পূজা-অর্চনার কাজে আখের রসে প্রস্তুত দ্রব্যের পরিবর্তে কেবল মধুর ব্যবস্থা দেখিয়া এই অনুমানই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে চরকে উল্লিখিত দুই জাতের ইক্ষু এবং ইক্ষুরসের উৎপন্ন পাঁচ প্রকার দ্রব্যের কথা তুলনা করিয়া দেখুন। চরক পঞ্জাবের লোক ছিলেন, চরকসংহিতার বর্তমান সংস্করণ খ্রিষ্টের দুই শত বৎসরের মধ্যের। পঞ্জাব আখের চাষের অনুকূল নহে, আখের চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু আবশ্যক। সুশ্রুত বিহারের অধিবাসী ছিলেন, পাঁচ শত খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে। তিনি চরকে বর্ণিত দুই জাত ব্যতীত আরও দশ জাতের ইক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটি বন্য। ইক্ষুর দ্বাদশ জাত উৎপন্ন হইতে কত কাল লাগিয়াছিল ?

অথবা, গোধূম ধরুন। গোধূম ঋগ্বেদের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল। বেদে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়া একথা বলিতেছি না, পূজার নৈবেদ্যে পিতৃপুরুষের তর্পণে গোধূমের বিধান নাই। আর্যেরা যে ভোজ্য গ্রহণ করিতেন, আমরা সেই ভোজ্য তর্পণে উৎসর্গ করি। যেমন যব ও তিল। কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদে (৬।৩) গোধূম ও মসূর এই দুইটি বিদেশাগত শস্য সাধারণ খাদ্যদ্রব্য গণ্য হইয়াছে। সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারোর ভগ্নাবশেষ খ্রিঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই মহেঞ্জোদারো খননে

গোধূম পাওয়া গিয়াছে—ইহা বিবেচনা করিবার বিষয়। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ নিজেদের দেশ এবং সমুদ্র দেখিয়াছিলেন। সরস্বতী সমুদ্রে পড়িত, সরস্বতীর মোহানা হইতে মহেঞ্জোদারো অধিক দূরে ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহারা গোধূম জানিতেন না; জানিলে তাঁহাদের স্বল্পসংখ্যক আহার্যদ্রব্যের মধ্যে উহাও স্থান পাইত। অতএব বলিতে পারা যায়, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে সিন্ধুর আবিষ্কৃত কৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল। যজুর্বেদ খ্রিষ্টের প্রায় ২,৫০০ বৎসর পূর্বের। ইহার দৃঢ় জ্যোতিষিক প্রমাণ আছে। যজুর্বেদে বৈদিক আচার-পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অলৌকিকত্বের বিকাশ এবং জ্যোতিষ জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদের কালের মধ্যে শত শত বর্ষ কালগর্ভে লীন হইয়াছিল।

পুরাণে ও মহাকাব্যে প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইক্ষ্বাকুর ও তাঁহার বংশের কয়েক জনের নাম ঋগ্‌বেদে (১০।৬০।৪) পাওয়া যায়। বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায়, ইক্ষ্বাকু হইতে বৃহদ্‌বল পর্য্যন্ত এই বংশের ৯৫ জন রাজা পরে পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধিকাংশের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ছিল। বৃহদ্‌বল কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে নিহত হন। খ্রিঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দের নিকটবর্তী কালে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। যদি এক শতাব্দে পাঁচ জন রাজা ধরা যায়, তাহা হইলে এই ৯৫ জন রাজার রাজত্বকাল ১৯০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহার সহিত ১৪৫০ বৎসর যোগ করিলে ইক্ষ্বাকুকে খ্রিষ্টের ৩৩৫০ বৎসর পূর্বে লইতে হয়। অবশ্য ইহা স্থূল অনুমান। ইক্ষ্বাকুর পিতা নামে পরিচিত বৈবস্বত মনুর কাল সম্ভবতঃ খ্রিঃ পূঃ ৩,৫০০ অব্দের নিকটবর্তী, ইহা উপরের অনুমানের সমর্থক। খ্রিঃ পূঃ ৩,৫০০ হইতে ৩২৫০ অব্দের মধ্যে নক্ষত্র-বিদ্যার আরম্ভ হইয়াছিল। চন্দ্রের গতিপথ সাতাইশ নক্ষত্র দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল।

আরও দেখি, ঋগ্‌বেদে (১০।৯৮।১) কুরু-বংশীয় ভীষ্মের পিতা শান্তনুর উল্লেখ আছে। পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সর্বশেষে বেদের স্তোত্রগুলি সাজাইয়াছিলেন, তিনি শেষ ব্যাস। তিনি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের সময় বর্তমান ছিলেন। সুতরাং বেদের শেষ সংস্কার খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে হইতে পারে নাই।

ঋগ্‌বেদ ইতিহাস নহে, ইহাতে ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ নাই। স্তোত্রগুলি এক স্থানে বা একই কালে রচিত হয় নাই। ইহাতে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে, অতীত কাহিনীরও আছে। কতকগুলি স্তোত্র অন্যগুলির বহু পরে রচিত হইয়াছিল।

কোনও সাহিত্যরচনার বয়স নির্ধারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তাঁহারা ব্যাকরণের নূতনতম বিভক্তির প্রয়োগ, সংস্কৃতির নূতনতম রূপ দ্বারা উহার বয়স নির্ধারণ করেন। তাঁহারা মন্দিরের শেষ স্থাপিত ইষ্টক দ্বারা, সর্বশেষে নির্মিত পুত্তলিকা দ্বারা মন্দিরের কাল নির্ণয় করেন। ভারতের সনাতন রীতি অন্যবিধ। অনিবার্য, আগন্তুক, বহিঃপৃষ্ঠের উপাদান উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিত

মন্দিরটিকে সমগ্রভাবে দেখিয়া তাহার ভিত্তিস্থাপনের কাল নিরূপণে যত্নবান হন। সেই জন্ত তাঁহাদের মত, বেদের কাল কেহ ঠিক বলিতে পারে না,—ইহা এতই পুরাতন।

আধুনিক কালের লোক আমরা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ঋষিরা বেদগান করিবার পর কত কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার আভাস পাইতে চাই; মন্দিরের বয়স নহে, মন্দিরের দেবতার প্রতিষ্ঠাকাল। বর্তমান বেদগ্রন্থ খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দের হউক,—আমাদের সে প্রশ্ন নয়। আমরা জানিতে চাই, ইহার প্রধান প্রধান দেবতা কতকাল পূর্বে প্রথম স্তুত হইয়াছিলেন।

বেদ কখনও প্রস্তর বা ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ হয় নাই। সুতরাং ভাষাবিচারের সার্থকতা নাই। বেদের স্তোত্র পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। আর, যে গান এত মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে তাহার মূল ভাষা একেবারে পরিবর্তিত না হইলেই আশ্চর্যের কথা। বেদেই আছে, কোন কোন পুরাতন স্তোত্র মার্জিত হইয়াছে। তথাপি ভাষা আলোচনার প্রয়োজন আছে। বেদবিদ্যায় প্রবেশের প্রথম সোপান এই। কিন্তু ইহার প্রয়োজন-সীমা ভুলিয়া গেলে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ফলে অন্ত উপায়ে যে সকল বিশ্বাস-যোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে সে সকলকে ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানে বসাইতে গেলে বিমূঢ় হইতে হয়। দূরবর্তী বনানীর বৃক্ষসমূহের মত বেদের সকল বিষয়বস্তু তখন গবেষকের চক্ষে ঘনসন্নিবিষ্ট দেখায়, তাহাদের মধ্যে যে অবকাশ ও অন্তরাল আছে, পটভূমির অভাবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অপিচ, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা সহজ, কিন্তু এক একটি স্তর নির্মাণে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছে তাহা বলা সহজ নহে। সেইরূপ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, সূত্র—ইহাদের পারম্পর্য হইতে বৈদিক সাহিত্যের তিন শাখার কোনটির কাল অভ্রান্ত ভাবে নিরূপণ আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাচীন কালে উন্নতির গতি মৃদু ছিল, এক পদ অগ্রসর হইতে বহু শতাব্দ কাটিয়া যাইত। বৈদিক সাহিত্য পবিত্র ও গুহ্য; আর এরূপ শাস্ত্রের পরিবর্তন আদৌ হয় না বলিলে চলে। যে কালে ও কারণে ধর্মবিধির প্রচলন হয়, সেই কাল ও কারণ লোপ পাওয়ার পরও বহুদিন ধরিয়া সে বিধান বলবৎ থাকে। অনুরূপ ঘটনার সুপরিজ্ঞাত সময়পঞ্জীর সঙ্গে না মিলাইয়া বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি অনুমানেরও কোনও অর্থ থাকে না। পার্শ্ব, মহাবীর, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত কাল পরিমাণের চেষ্টা হইয়াছে। এ যেন পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া উহার আরম্ভ ও দৈর্ঘ্য অনুমান! এবম্বিধ উৎপ্রেক্ষা মাত্রই কাল্পনিক, এই হেতু কল্পকের স্বভাব, শিক্ষা ও মতি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপের হইয়া থাকে।

প্রোফেসার কীথ লিখিতেছেন, "সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিকাশ, মোটামুটি ইহাই শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। ব্রাহ্মণ রচনার যুগ খ্রিঃ পূঃ ৮০০ অব্দের পরে হওয়া সম্ভব নহে, এবং উষার বন্দনার তুল্য সুপ্রাচীন স্তোত্র খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারে"।[১] অর্থাৎ ইহাই ঋগ্‌বেদের প্রাচীনত্বের সীমা। ইঁহার মতে যজুর্বেদের বয়স খ্রিঃ পূঃ ৮০০—৬০০ অব্দ। ইহা ভারতের ইতিহাস নামক এক বৃহৎ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

১ A. B. Keith. The Cambridge History of India. Vol. I. Ch. IV. 1922.

এই উৎপ্রেক্ষায় প্রোফেসার উইন্টারনিৎস সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "খ্রিঃ পূঃ ১২০০ কিম্বা ১৫০০ অব্দ আরম্ভ ধরিলে এই সুবৃহৎ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ কি করিয়া হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, এই বিশাল সাহিত্যের আরম্ভ খ্রিঃ পূঃ ২,০০০ বা ২,৫০০ অব্দ এবং শেষ খ্রিঃ পূঃ ৭৫০ ৫০০ অব্দ ধরিতে হইবে।[২] কিন্তু বোধ হওয়ার হেতু সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে না পারিলে এবং পরীক্ষিত না হইলে তাহা জনে জনের 'বোধ' হইয়া দাঁড়ায়। আর্য সংস্কৃতির ও সাহিত্যের অনুরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই, তুলনা দ্বারা কালনির্দেশের সুযোগও নাই।

জ্যোতিষের সাক্ষ্যই পুরাকাল-নির্ণয়ে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। ইহা দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, কিসেরও অপেক্ষা রাখে না। ইহার পক্ষপাত নাই, মতপরিবর্তন নাই। ইহাই প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসের কাল সংশোধন করিবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বেদের মধ্যে কালসমুদ্রে দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ দ্বীপ আছে। পঞ্জিকা না থাকিলে হিন্দুর চলে না, কেন চলে না তাহা হিন্দুমাত্রেই জানেন। আমাদের যাবতীয় ধর্ম-কৃত্যের দিন নির্দিষ্ট আছে। এই লক্ষণ ঋগ্‌বেদের যুগেও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ যে সকল যাগযজ্ঞ করিতেন তাহাদের দিন নির্দিষ্ট থাকিত। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল দিনের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। পঞ্জিকার প্রাচীন নাম কালজ্ঞান। বেদের কালের কালজ্ঞান যতই সংক্ষিপ্ত, অশুদ্ধ বা অপরিণত হউক, ধর্মানুষ্ঠানে তাহা মানিয়া চলিতে হইত।

পঞ্জিকার কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় বহু পূর্বেই পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যেমন, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকাপ্রমুখ সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম আছে। কৃত্তিকা নামটি বহুবচনে আছে, সুতরাং তারাপুঞ্জ কৃত্তিকাকেই বুঝাইতেছে। এখন এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠে, যে,—প্রথম স্থান কৃত্তিকাকে কেন দেওয়া হইল, অশ্বিনী বা অন্য নক্ষত্রকে কেন দেওয়া হইল না? এখন যে পর্যায় প্রচলিত আছে, তাহাতে অশ্বিনীর নাম সর্বপ্রথমে, কারণ অশ্বিনীতে বিষুবপাত হইত। ইহা দেখিয়া আমরা বলি যে উক্ত সংহিতার সময় কৃত্তিকায় বিষুবপাত হইয়াছিল। ইহা খ্রিঃ পূঃ ২২০০ অব্দের ঘটনা।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার *Orion* নামক গ্রন্থে আরও কতকগুলি জ্যোতিষিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি কৃত্তিকায় বিষুবপাত কালের পূর্ববর্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ও চিত্রা পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ নির্দেশ করেন। প্রথমটি আমাদিগকে খ্রিঃ পূঃ চারি সহস্র অব্দে লইয়া যায়, দ্বিতীয়টি খ্রিঃ পূঃ ছয় সহস্র অব্দে।

তিলক যখন তাঁহার বই লেখেন তখন প্রোফেসার জাকোবি বেদের প্রাচীনত্বের অনুরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন।[৩] উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

---

২ M. Winternitz · A History of Indian Lit Vol I. p. 309. 1927.

৩ H. Jacobi. "On the date of the Rigveda." English Translation. *Indian Antiquary*, Vol. 23 June, 1894. Also, "On the Antiquity of Vedic Literature," *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1909.

প্রোফেসার জাকোবি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ভর দিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে ঋগ্‌বেদের সংস্কৃতির কাল খ্রিঃ পূঃ ৪৫০০ হইতে খ্রিঃ পূঃ ২,৫০০ অব্দ পর্যন্ত। তিনি তিলকের মতন অধিক দূর যান নাই।

বলা বাহুল্য, যে সকল পণ্ডিত ভাষার চর্চা করিয়া বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। তিলক ও জাকোবির সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রোফেসার হুইট্‌নি, থিব. ও ওল্ডেন্‌বার্গ লেখনী সঞ্চালন করিলেন।৪ প্রমাণগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা অলীক কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, কোনও কোনও স্থানে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন। কোথাও বা বিভিন্ন গ্রন্থের কাল-ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই চারি পণ্ডিতের মধ্যে প্রোফেসার হুইট্‌নি কালনির্ণয়ে যোগ্যতম ছিলেন। তিনি বেদে প্রবীণ ছিলেন, জ্যোতিবিদ্যাতেও ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয়দের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল। তিনি ধীরভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা যে নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিতে বা কোনও জ্যোতিষিক ঘটনা নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে, নক্ষত্রমালা কোনও উন্নত জাতির নিকট হইতে নিশ্চয় ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রোফেসার কীথের মতন যাঁহারা প্রাচীন বেবিলনের ধ্বংস হইতে কৃত্তিকাশ্রেণী ভবিষ্যৎ কালে বহিষ্কৃত হইবে, এই আশা পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা হুইট্‌নির এই মত পড়িয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অবশ্য এ পর্যন্ত সেদিক্ হইতে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই।

গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে হিন্দুদের নিকট বিষুবদিনের প্রয়োজন ছিল না। এই অলীক যুক্তি দিয়া ডক্টর থিব. কৃত্তিকার প্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতের সমর্থনে তিনি বলেন যে, "বৈদিক সাহিত্যে মুখ্য বা গৌণভাবে বিষুবদিনের বা তৎসম্পর্কিত ব্যাপারের কোনও উল্লেখ নাই।" কিন্তু এই যে দেখা যাইতেছে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকায় বিষুবসংক্রান্তির উল্লেখ রহিয়াছে। এই তর্ক তিনি এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন যে, কৃত্তিকার উল্লেখ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের ভ্রান্ত পাঠ! অর্থাৎ তৈত্তিরীয় সংহিতা ও উক্ত জ্যোতিষ একই কালের রচনা। তিনি একটু গণনা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, সংহিতায় কৃত্তিকা 0° অংশে, আর বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ১২° অংশ দূরে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে আট শত বৎসর কালেরও অধিক ব্যবধান। তাঁহার আলোচনায় তিনি আরও আশ্চর্য আশ্চর্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তথাপি প্রোফেসার কীথ মন্তব্য করিয়াছেন, "হুইট্‌নি, থিব. এবং

৪ W. D. Whitney. "On a recent attempt by Jacobi & Tilak to determine on astronomical evidence the date of the earliest Vedic period as 4,000 B. C." *Indian Antiquary*, Vol. 24, April 1895.

G. Thibaut. "On some recent attempts to determine the antiquity of Vedic Civilisation." *Indian Antiquary*, Vol. 24, April 1895. ওল্ডেনবার্গের সমালোচনাটি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। Vedic Indexএ উদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হইতেছে উহা থিবর মতেরই প্রতিধ্বনি।

ওল্ডেনবার্গের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে জাকোবির কালমূলক সিদ্ধান্ত টিকিতে পারে না।" তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন, বুলার, বার্থ ও উইন্টারনিৎস্ এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলেন নাই। জাকোবি স্বয়ং ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সময় খ্রিঃ পূঃ নয় সহস্র বৎসর পাই। তখন অঙ্গিরস, অর্থবন্, ভৃগু প্রভৃতি পরবর্তী কালে পিতৃনামধেয় পূর্বপুরুষগণ পঞ্চনদের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রথম যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করেন। তখন হইতেই পর পর জ্যোতিষিক প্রমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিয়াছে। খ্রিঃ পূঃ সাড়ে ছয় সহস্র হইতে আরম্ভ করিয়া খিঃ পূঃ সাড়ে চারি সহস্র অব্দ উত্তীর্ণ হইয়া শেষে খ্রিঃ পূঃ সাড়ে তিন সহস্র অব্দ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। এইখানেই ঋগ্‌বেদের যুগ শেষ বলিতে পারা যায়। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম এবং অন্য দুই একটি ছোটখাট ঘটনা ভিন্ন জ্যোতিষ বিষয়ে কোনও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ আর তেমন পাওয়া যায় না। নূতন কোনও দেবতার আবির্ভাব হয় নাই, পরন্তু পুরাতন দেবতাগণ পুরাতন বৈদিক স্বরূপ বর্জিত হইয়া এখন ভাবময় বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঋগ্‌বেদ খণ্ডিত। ইহাতে কোন বিশেষ যুগের আর্য কৃষ্টির রূপ পাওয়া যায় না। তথাপি মহেঞ্জোদারোর অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্যর জন মার্শেল যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার কয়েকটির উত্তর দিতে পারা যায়। তিনি আবিষ্কৃত সিন্ধুর কৃষ্টিকে খিঃ পূঃ সাড়ে বত্রিশ শত ও সাড়ে সাতাশ শত অব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারতের মাটিতেই এই কৃষ্টির বহুদিনের পূর্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে। তাঁহার মতে ইহা দ্রাবিড় কিম্বা সুমেরীয় জাতির কীর্তি নহে। সিন্ধুরা শিব, লিঙ্গ ও মাতৃদেবীর উপাসক ছিলেন। আমরা ঋগ্‌বেদ হইতে জানি যে ভগবান্ রুদ্র খ্রিঃ পূঃ সাড়ে চারি সহস্র অব্দের কালে প্রাধান্য লাভ করিয়া ঋগ্‌বেদের দেবমণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছিলেন। যজুর্বেদে (খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে) তাঁহার উপাসনার সুস্পষ্ট বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিঃ পূঃ ৪,০০০ অব্দে বিষ্ণু ও ইন্দ্র অভিন্ন হইয়াছিলেন। বিষ্ণু শিব ও মাতৃদেবী শিবাণী অদ্যাপি গ্রামে গ্রামে প্রধান দেবতারূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সিন্ধুরা বিদেশী ছিলেন না; তাঁহাদের বংশধরেরা ভারত ত্যাগ করেন নাই। প্রাচীনপন্থী ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আর্যেরা খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। স্যর জন মার্শেল এই মতে চালিত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। সিন্ধুরাও যে আর্য, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বোধ হয় এইটুকু বলিতে পারা যায়, তাঁহারা ঋগ্‌বেদীয় আর্য ছিলেন না। পরে কিন্তু উভয় সম্প্রদায় অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই হেতু সিন্ধুদের আর পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভাষাবিদ্‌গণ না বুঝিয়া ভারত ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইয়া কি ক্ষতি করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সকলেই জানেন, ভাষাবিদ্‌গণ নানা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু একটিও প্রমাণ করিতে পারেন না।